১৩ নভেম্বর ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

আপনার শিশুর ভবিষ্যতের বাড়বৃদ্ধি, তার প্রথম বছরের পুষ্টির ওপর নির্ভর করে।

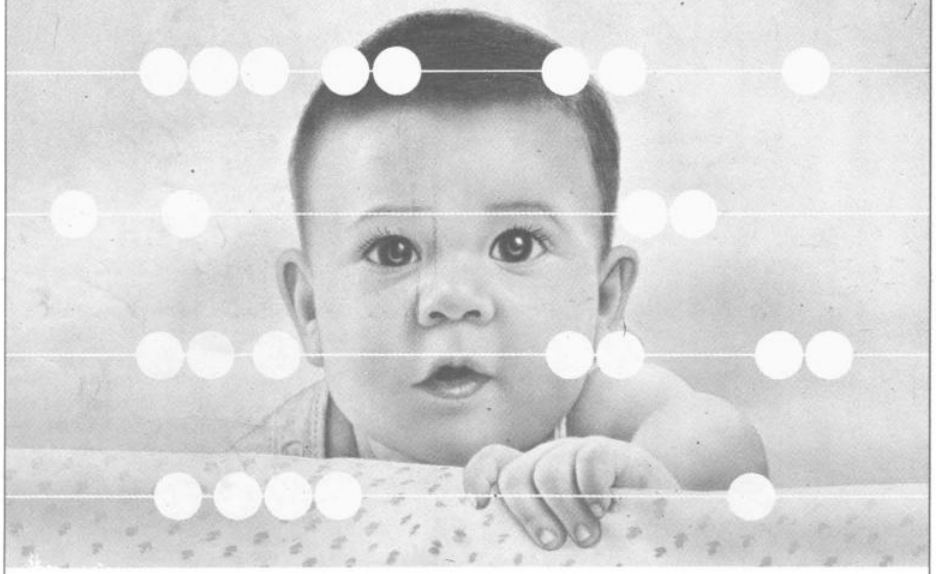

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার

আপনার শিশুকে দেয়– সবদিক থেকে দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্যে তার একান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় পুষ্টি!

ডাক্তার এবং পুষ্টি-বিশারদদের মতে, শিশু প্রথম বছরে যে পুষ্টি পায় তার গুরুত্ব খুব বেশী।

তাই গ্ল্যাক্সো, আপনার শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগাতে বিশেষভাবে তৈরী করেছে —দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার!

ফ্যারেক্স হ'ল প্রোটিন-সমৃদ্ধ যা শিশুর বাড়বৃদ্ধির জন্যে একান্ত প্রয়োজন। এতে যে বাড়তি আয়রণ আছে, তা শিশুকে বেশী সুস্থ রক্ত যোগায় এবং এর সঠিক অনুপাতের ক্যালসিয়াম আর ফসফরাস—শিশুর দাঁত ও হাড় মজবুত করার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চার মাস মত বয়েস থেকে আপনার শিশুকে দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার দিন।

এর মুখরোচক স্বাদ ওর দারুণ ভালো লাগবে—আর, এমন হেসে খেলে তরতর ক'রে বেড়ে উঠবে—দেখে আপনি গর্ব অনুভব করবেন!

সস্নেহ উপহার এনেছে গ্ল্যাক্সো!

দুধ মেশানোই থাকে

CLARION/B/GX/8/244BEN - A

আনন্দমেলা

[illegible]

সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)

পুরী প্যাসেঞ্জার । রতন ভট্টাচার্য ৩৫

গল্প

রহস্যময় ঘড়ি । অশোক বসু ৫
সাত্যকি সোমের সত্যান্বেষ । রেবন্ত গোস্বামী ১৫
মুকুট । মানবেন্দ্র পাল ২৪
নেংটিস ইণ্ডারিকা । চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত ২৭
শ্রীচরণ না থাকলে । অলককিরণ দেব ৩১

ভ্রমণকাহিনী

সোনার কেল্লার শহরে। অশোককুমার মিত্র ৯

ধারাবাহিক উপন্যাস

গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৬
শয়তানের চোখ । সমরেশ মজুমদার ৫৫

ছড়া

ভাগ্নে যাবে মামার বাড়ি । প্রণব মাইতি ২৯

বিজ্ঞানবিচিত্রা

এলাম আমি কোথা থেকে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৩
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৫৪

শার্লক হোমসের গল্প

মণিমুকুট । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫১

লেখাপড়া

প্রাংশু····প্রাহু (অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ৩৩
ভাইফোঁটার আগে (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ৩৩

ডাক্তারবাবু বলছেন

হেমন্তকালে কী করবে । (ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ৫৭

খেলাধুলো

সোনার মেয়ে উষা । সুব্রত সিংহ ৬২
দেওধর ট্রফিতে পশ্চিমাঞ্চলের হ্যাটট্রিক । সম্রাট রায় ৬৩
ক্রিকেট ছাড়লেন অ্যালান নট । অশোক রায় ৬৪
মরসুমে মোহনবাগানের প্রথম ট্রফি । সায়ন্তন সিংহ ৬৫
সামনেই শারজা। চন্দ্রভানু ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স

টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩৪
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০

অন্যান্য আকর্ষণ

তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮
মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯
পি· টি· উষার পুরোপাতা রঙিন ছবি ৬১

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক। যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ– অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক। ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

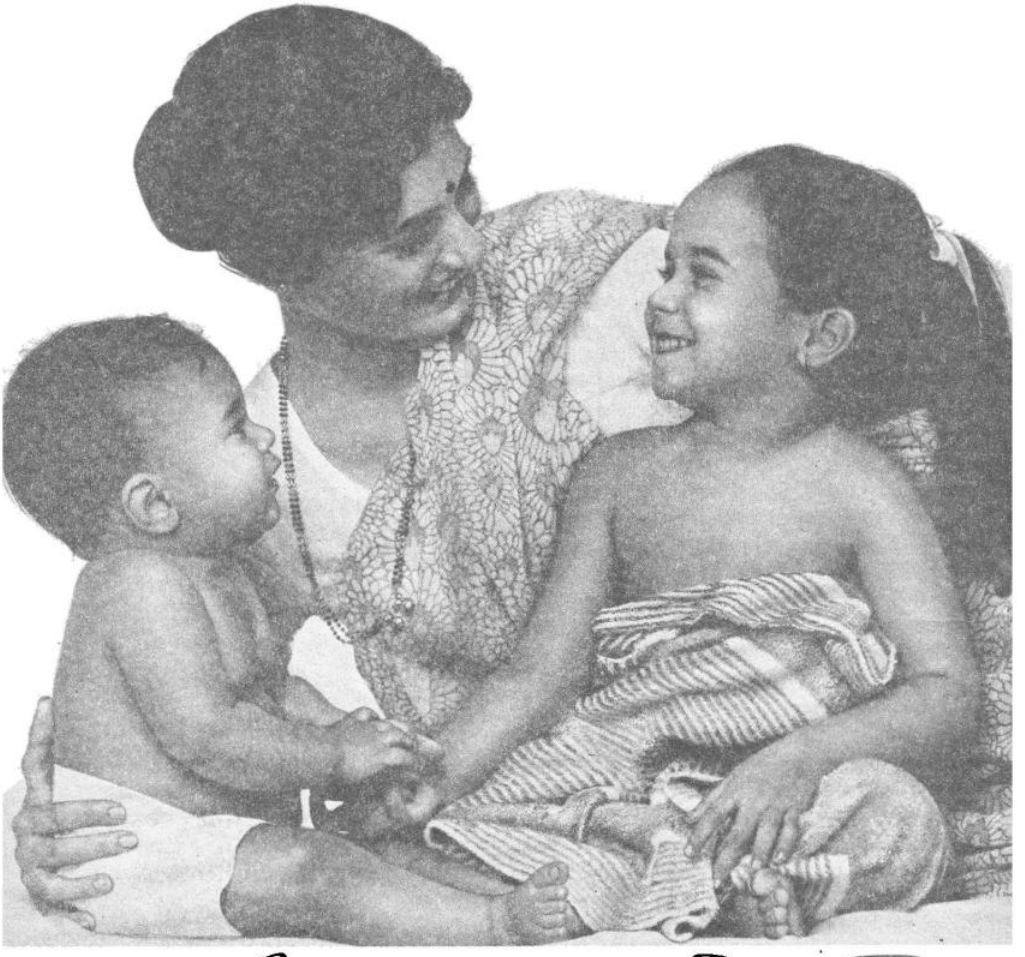

অনুভূতি এমন, যা সঙ্গ দেয় সারাজীবন

মধুর মমতাভরা যত্নের ছোঁয়া জন্ম থেকেই পেয়ে
এসেছেন যার··· সেই, জনসন্স বেবী পাউডার – কোমল যেন
মমতার পরশ··· বিশুদ্ধ আর মৃদু ! এর স্নেহধারা বর্ষিত হয়
আপনার ওপরে, দিনের পর দিন ধরে ! তাইতো, শিশুকাল হয়ে
গেলেও পার··· জনসন্স বেবী পাউডারের সঙ্গে সম্বন্ধ, সারাজীবন
অটুট থেকে যায় আপনার !

কোমল যেন মমতার পরশ জনসন্স বেবী পাউডার

ঘাড়টা শেষ বন্ধ হয়োছল ছ'বছর আগে ...

রহস্যময় ঘড়ি

অশোক বসু

সাবেকি গঠন দেখেই বোঝা যায়, দেওয়াল-ঘড়িটা পুরনো আমলের। ডিজাইনটা অনেকটা গির্জাঘরের মতো। গাঢ় বাদামি রঙের ফ্রেম, লতাপাতার নকশাকাটা কাঁচের নীচে হালকা নীল ডায়াল আর রুপোলি কাঁটা, সোনালি রঙের গোল পেণ্ডুলাম। ঘন্টার সংখ্যাগুলো রোমান হরফে লেখা। কিন্তু এ-রকম ঘড়ি তো যে-কোনও প্রাচীন বনেদি বাড়ি গেলে হামেশাই দেখা যায়। আসলে ঘড়ি নয়, শ্যামলেন্দুকে আকৃষ্ট করল এর ঘন্টা বাজার শব্দ। এখন রাত্রি আটটা। ঘড়িতে পর পর আটবার ঘন্টা বাজার শব্দ হল। অদ্ভুত সেই শব্দ। যেন ঘড়ি থেকে নয়, গভীর গম্ভীর শব্দগুলো বহুদূর থেকে ভেসে এসে মিলিয়ে গেল এই হৃতগৌরব প্রাচীন জমিদারবাড়ির বাইরের নিস্তব্ধ অন্ধকারে। প্রতিটি ঘন্টার শব্দ সময়ের অপ্রতিরোধ্য নির্দেশ ঘোষণা করে গেল যেন।

শ্যামলেন্দুকে ঘড়িটার দিকে অবাক-চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে গৌতম বলল, "ঘড়িটা যুদ্ধের সময় নিলামে কিনেছিলেন আমার ঠাকুরদা। শব্দটা অদ্ভুত। কিন্তু তার চেয়ে অদ্ভুত ঘড়িটা।"

দু'বন্ধু মুখোমুখি বসে গল্প করছিল। নিজেদের বিগত জমিদারির শরিকানার অংশ হস্তান্তরের ব্যাপারে গৌতমকে উত্তরবঙ্গে এই মফস্বলের বাড়িতে আসতে হয়েছে বহু বছর বাদে, সঙ্গে বন্ধু শ্যামলেন্দুও চলে এল দু-চারদিন বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য। এসে ভালই লেগেছিল। দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজ মাঠ, শীত-শেষের রবিশস্য, নীল আকাশ, অবাধ হাওয়া, মাটির গন্ধ, অসংখ্য গাছগাছালি-ঘেরা গৌতমদের জমিদারবাড়ি, এই শান্ত স্নিগ্ধ খোলামেলা পরিবেশ যতটুকু ভাল, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাল লেগে গেল কলকাতার ভিড় আর গোলমাল থেকে হঠাৎ চলে এসে। কিন্তু সন্ধে হওয়ার পরই সবকিছু অন্যরকম হয়ে যায়। রাত্রি এখানে শহরের মতো আলোয় ঝলমল করে ওঠে না। সন্ধে হলেই চারদিকে নেমে আসে থমথমে অন্ধকার। তখন ঘরে বসে বইপড়া, গান শোনা কিংবা গল্প করে সময় কাটিয়ে দিতে হয়। বাইরের বিশাল ভূখণ্ড নির্জন অন্ধকারে নিস্তব্ধ আর রহস্যময় হয়ে থাকে। রাত্রি এখানে গভীর হয় প্রাকৃতিক নিয়মে, ঘড়ির কাঁটার আঙ্কিক হিসেবে নয়।

কয়েক বিঘে জমির বিরাট অংশ নিয়ে মস্ত দোতলা বাড়ির নীচের তলা আর ওপর তলা নিয়ে অনেকগুলো ঘর ফাঁকাই পড়ে থাকে সারা বছর। সপরিবারে গৌতমের এক কাকা আর দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের থাকতে লাগে মাত্র কয়েকটা ঘর। বাকিগুলো তালাবন্ধই হয়ে থাকে। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত কেরোসিনের আলো জ্বলত এ-অঞ্চলে, এখন ইলেকট্রিকের আলো এসেছে। কিন্তু তাতে আলোই বেড়েছে, জমিদারির ভগ্নদশার কিছুমাত্র উন্নতি হয়নি। সম্প্রতি কিছু জমিজমা কিনে নেওয়ার প্রস্তাব এসেছে। লাভজনক না হলেও প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছেন গৌতমের বাবা। গৌতমের এখানে আসা সেইজন্যেই।

ঘরে বসে সেইসব গল্প করছিল গৌতম। গল্পটা পরম্পরা হারিয়ে ফেলল ঘড়িতে আটটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে।

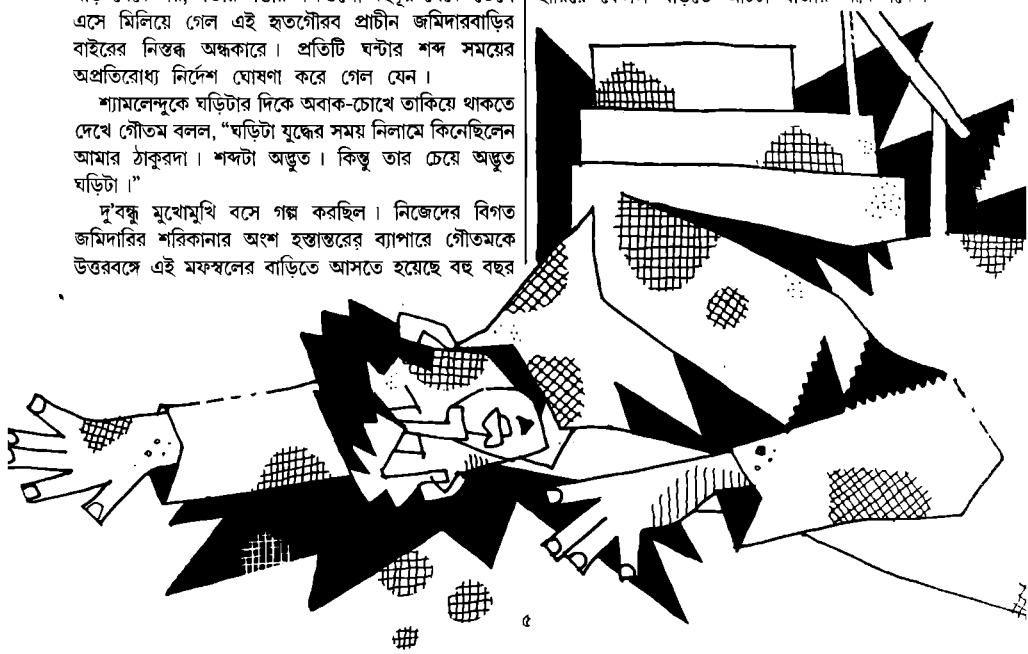

"ঘড়িটা অদ্ভুত কেন ?" শ্যামলেন্দু প্রশ্ন করল।

ঘড়ির ঘন্টার শব্দ গৌতমকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। একটু সময় চুপ করে রইল সে। তারপর বলল, "এখানে প্রায় পাঁচ-ছ' বছর পরে এলাম, ঘড়িটাকে আমিও দেখছি বহু বছর পরে। অনেক বছর হয়ে গেল ঘড়িটা এ-বাড়িতে আছে। সময় দেয় প্রায় নিখুঁত। কিন্তু হঠাৎ কোনওদিন, কয়েক বছরের ব্যবধানে বন্ধ হয়ে যায়। ফের চালিয়ে দিলে কিন্তু আগের মতোই চলতে থাকে।"

শ্যামলেন্দুর মনে হল গৌতম ঘড়িটার সম্বন্ধে তার কথা শেষ করেনি, আরও কিছু বলবে। সম্ভবত কোনও গল্পকথা বলার আগে মনে-মনে প্রস্তুত হচ্ছে। শ্যামলেন্দুর শুধু দরকার যোগসূত্রটা ধরে রাখার। সে বলল, "কিন্তু এতে অদ্ভুতের কী আছে ? যন্ত্রচালিত যে-কোনও জিনিসই যখন-তখন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ঘড়িটা এখন দিব্যি চলছে, কিন্তু এখনই যদি দেখা যায় ঘড়িটা আর চলছে না, পেণ্ডুলামটা থেমে আছে, তাতে অবাক হব কেন !"

শ্যামলেন্দুর কথা শুনে গৌতম যেন ভয়ানক চমকে উঠল। মুহূর্তে তার মুখ থেকে সব রক্ত সরে গেল। একটু সময় ভয়ার্ত চোখে শ্যামলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শ্যামলেন্দু বুঝল এইটাই এই ঘড়ির বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্বই ঘড়িটাকে গল্পের ঘড়ি করে দিয়েছে।

গৌতমের কাকিমা চা নিয়ে এলেন। পঞ্চাশ-পেরোনো, ফরসা, শান্ত, হাসিখুশি-মুখের এই কাকিমা আজ সকালে শ্যামলেন্দু এখানে আসবার পর থেকেই নিজের ছেলের মতোই আদর-যত্ন করছেন। গৌতমের কাকাও খুব ভালমানুষ। এই জনবিরল বাড়িতে নতুন মানুষ পেয়ে কাকিমার মতো তিনিও খুশি হয়েছেন।

গৌতম বলল, "আচ্ছা কাকিমা, দিপু মারা গেছে বছর ছয়েক হবে, তাই না ?"

কাকিমা বোধহয় এমন কোনও প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। একটু চুপ করে থেকে মৃদু গলায় বললেন, "হ্যাঁ, এই ফেব্রুয়ারিতে ছ'বছর হল।"

গৌতম চুপ করে থেকে চা খেল। কাকিমা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ কোনও কথা না বলে চুপ করে রইল। তারপর বলল, "ঘড়িটা শেষ বন্ধ হয়েছিল ছ'বছর আগে, আমার ভাই দিপু যেদিন মারা যায়। শ্যামলেন্দু, আমার সব কথা শেষ হলেই বুঝতে পারবি, ঘড়িটা অদ্ভুত বলছি কেন।"

শ্যামলেন্দু নড়েচড়ে বসল। সে বেশ বুঝতে পারছিল, ঘড়ি বন্ধ হওয়া আর গৌতমের ভাইয়ের মৃত্যু, এ-দুটোর মধ্যে একটা ইতিহাসের সাঁকো আছে। সেই সাঁকো পার হয়ে এখন গল্পের দরজা খুলবে গৌতম।

"সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড-ওয়ারের সময় কলকাতার সাহেব-পাড়া থেকে এই ঘড়িটা নিলামে কিনেছিলেন আমার বাবার বাবা। নামী সুইশ কোম্পানির ঘড়ি, দেখতে শুনতেও বেশ খানদানি, দারুণ গমগমে ঘন্টার আওয়াজ, ঠাকুরদা তাঁর ঘরের দেওয়ালে ঘড়িটা টাঙিয়ে রাখলেন। ঘড়িটা থাকল। দু-তিন বছর পরে দেখা গেল ঘড়িটা একদম সঠিক সময় দিচ্ছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এখনও, এই চল্লিশ-একচল্লিশ বছর পরেও, ঘড়িটা আগের মতনই আছে। কখনও স্লো কিংবা ফাস্ট হয়নি। কিন্তু ঘড়িটার চলা নয়, ঘড়িটা হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আবিষ্কার হল এক ভয়াবহ সত্য। আর ঘড়িটা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল এক জীবন্ত বিভীষিকা।"

"কেন ?" গৌতম থামলে শ্যামলেন্দু প্রশ্ন করল। যদিও প্রশ্ন করার কোনও দরকারই ছিল না। সে বেশ জানে সব 'কেন'র উত্তর দিতে যে-গল্পটা এক্ষুনি গৌতম বলবে, সেটা সে মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছে।

"ঘড়িটা এ-বাড়িতে আসবার চার বছর পরে আমার ঠাকুরমার মৃত্যু হয়। নানান অসুখে-বিসুখে দীর্ঘদিন ভুগছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনি মারা যান। ঠাকুরমা মারা যাবার তিন বছর পর মারা গেলেন ঠাকুরদা। চেয়ারে বসেই হার্টফেল করেন। আশি বছর বয়েসের মৃত্যু, যে-কোনওভাবে, যে-কোনও সময়ে হতে পারে। সে-মৃত্যুকে অস্বাভাবিক ভাববার কোনও কারণ নেই। মৃত্যু নয়, অন্য একটা জায়গায় এক অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা গেল। ঠাকুরমার মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে ঘড়িটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। দেখা গেল, ঠাকুরদার মৃত্যুর দিনও ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। প্রথম বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে কেউ বিশেষ ভাবেনি, কিন্তু দ্বিতীয়বার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দুটো ঘটনার একটা অলৌকিক মিল লক্ষ করা গেল। ঘড়িটা এ-বাড়িতে আসবার পর দু'বার বন্ধ হল, এবং দু'বার বন্ধ হয়ে দুটো জীবনের স্পন্দন বন্ধ করে দিল। তা হলে ?

"তবু, এসব সত্ত্বেও ব্যাপারটাকে কাকতালীয় মনে করা যেত। এমনটি তো হতেই পারে। দুটো ঘটনা আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গেছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু না, ঘটনাকে সে ধরনের কিছু ভাববার সুযোগ পাওয়া গেল না। ঠাকুরমা, ঠাকুরদা মারা যাওয়ার দশ বছর পরে আমার বাবার স্ট্রোক হয়। সেরিব্রাল থ্রমবোসিস। এবং প্রথম স্ট্রোকেই বাবা মারা যান। সেই মৃত্যুর শোকের চেয়েও তীব্রতর সেই আশ্চর্য ব্যাপারটা সবাইকে স্তম্ভিত করে দিল। হ্যাঁ, ঘড়িটা যথারীতি বন্ধ হয়ে আছে। কাঁটা দুটো থেমে আছে, পেণ্ডুলাম স্থির। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আতঙ্কের একটা শীতল স্রোত এ-বাড়ির সব কটা মানুষের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল।

"প্রথম দুটো ঘটনা আমার জন্মের আগেকার এবং কানে-শোনা। কিন্তু শেষ ঘটনাটা আমার নিজের চোখে দেখা। তার পরের ঘটনাগুলো কিংবা দুর্ঘটনাগুলোরও সাক্ষী আমি। বাবা মারা যাওয়ার দু'বছর পরে আমার মা, মায়ের মৃত্যুর তিন বছর পরে বাড়ির পুরনো চাকর হরিহর এবং ছ'বছর আগে আমার ভাই দিপু মারা যায় এ-বাড়িতে। এবং দেখা গেছে প্রতিটি ঘটনার কয়েক মিনিট আগে চলতে-চলতে হঠাৎ ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা কে কী বলবে, জানি না। অলৌকিক ঘটনাগুলোকে আমিও বিশ্বাস করতে চাই না। কিন্তু বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি। বিজ্ঞান দিয়ে, যুক্তি তর্ক বুদ্ধি দিয়ে এই অতিপ্রাকৃত ঘটনার কোনও বিশ্বাসযোগ্য কারণ খুঁজে পাইনি। এক মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো ঘড়িটা বহু বছর ধরে এ-বাড়িতে আছে। তাকালেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে ওঠে। এক হাড়-হিম-করা সন্দেহ সব সময় ছমছম করে মনে, আবার কবে কখন ঘড়িটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে, মৃত্যুর ছোবল কাকে কখন তুলে নেবে কে জানে ! অনেকবার ঘড়িটা বিক্রি করে দেওয়ার কিংবা এ-বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। আসলে ঘড়িটার ব্যাপারে কিছু করার সাহসই কারওর হয়নি। দারুণ ভয় ছিল,

যদি কোনও অজানা পথে নতুন করে কোনও বিপদ নেমে আসে। থাক বাবা, যেমন আছে, তেমনই থাক। আর একটা আশ্চর্যের কথা এই যে, ঘড়ি বন্ধ হত, কিন্তু কোনও যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে নয়। হঠাৎই বন্ধ হত, আবার চালিয়ে দিলে দিব্যি চলত, যতদিন না…"

"যতদিন না ?" শ্যামলেন্দু বিড়বিড় উচ্চারণ করল।

গৌতম কোনও কথা বলল না। কথা বলার দরকারও ছিল না।

ঘরের মধ্যে শুধু ঘড়িটা চলছে টিকটিক শব্দ করে। শ্যামলেন্দুর মনে হল, ঘড়ির নয়, সময়ের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক স্পন্দনের শব্দ শুনছে সে। ঘড়িটার দিকে তাকাল সে। নির্বিকার দার্শনিকের মতো স্থির হয়ে আছে।

অথচ ঘড়ির গল্পটা যতই ভয় আর রোমাঞ্চের হোক না কেন, পর পর ঘটনাগুলো আশ্চর্য সত্যি হলেও, শ্যামলেন্দুর মনে হল, ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনও অলৌকিক যোগাযোগ মেনে নেওয়া উচিত নয়। বলল, "ঘটনাগুলো শুনতে ভাল, এইরকম কোনও গ্রাম-গঞ্জের কুসংস্কার আর নানান বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জগতে বসে ভৌতিক গল্প বিশ্বাস করতেও লোভ হয়, কিন্তু কার্যকারণসম্বন্ধহীন এ-রকম কোনও ঘটনাকে বিশ্বাস করা মানে তো নিজের শিক্ষা আর বুদ্ধির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। একটা লোক যদি পর পর তিনবার লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পায়, তা হলে আশ্চর্য হব, তাকে বিস্ময়কর সৌভাগ্যবান মনে করব, কিন্তু কখনও মনে করব না কোনও অলৌকিক শক্তি ঘটনাকে ঘটিয়ে দিয়েছে। ফার্স্ট প্রাইজ তো একটা লোকই পাবে। ঘটনাচক্রে সেই ভাগ্যবান লোকটাই বারবার সেই একটা লোক হয়ে যাচ্ছে। এটা অবাক সমাপতন, কিন্তু ভৌতিক কাণ্ড নিশ্চয়ই নয়।"

গৌতম বলল, "তা বলে একটা নয়, দুটো নয়, পরপর পাঁচটা ঘটনাই হুবহু একরকম হবে ? শ্যামলেন্দু, তুই নিজের চোখে ঘটনাগুলো দেখিসনি আর শোকগুলোও ব্যক্তিগতভাবে তোকে পেতে হয়নি বলে তুই এর মধ্যে ব্যাখ্যা খুঁজতে চাইছিস। কী জানিস, সব শেষ কথা এখনও আমরা জানি না, এমন অনেক জিনিস আছে যা আমাদের বুদ্ধির অতীত। হ্যামলেটের সেই বিখ্যাত কথাটা…"

শ্যামলেন্দু হাসল, "কথাটা বহু পুরনো হয়ে গেছে রে। যা হোক, তোর অন্ধ-ধারণাটা, আমার মনে হয়, আমি ভেঙে দিতে পারব। যতদিন না গ্যালিলিওরা আসে, ততদিন সূর্যই পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে।"

গৌতম কিছু বলল না। অবিশ্বাসী চোখে শ্যামলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আপন মনে হাসল শুধু।

শ্যামলেন্দু নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে মনে মনে ভাবল, 'ঠিক আছে বন্ধু, আমিও প্রমাণ করে দেব, তুমি যা ভাবছ, তা মিথ্যে। একদম মিথ্যে।'

পরের দিন ঘটল সেই ঘটনাটা।

যে ঘরে ঘড়িটা আছে, পরের দিন সন্ধেবেলায় সেই ঘরে কেউ ছিল না। শ্যামলেন্দু একা-একা বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ বোলাচ্ছিল। ঢং ঢং করে ঘড়িতে সাতটা বাজল। শ্যামলেন্দু উঠে দরজার সামনে এসে বাইরেটা উঁকি মেরে দেখল। কেউ নেই। গৌতম নীচের তলায় কাকিমার ঘরে গেছে। বলে গেছে একটু পরেই আসবে। এখন ঘড়িটা বন্ধ করে দিলে কেউ জানবেও না। ঘড়িটা দেওয়ালের যেখানে আছে, মেঝেতে দাঁড়িয়ে সেখানে হাত পাওয়া যায় না, ঘরে চেয়ারটা একটুও শব্দ না করে টেনে আনল শ্যামলেন্দু তারপর কাঁচের ডালাটা খুলে ঘড়ির পেণ্ডুলামটা হাত দিয়ে ধরে থামিয়ে দিল। ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি। ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। গৌতমের আজগুবি বিশ্বাসে ধস নামবে একটু পরেই।

বিছানায় বসে আবার ম্যাগাজিনটা খুলল শ্যামলেন্দু। পড়ল না, ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ রেখে সে অপেক্ষা করে থাকল, গৌতম কখন এ-ঘরে আসে। কিন্তু এক মিনিট গেল, দু'মিনিট গেল, দশ, তিরিশ, চল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেল, তবু গৌতম এল না এ-ঘরে। এবার একটু অবাকই হল শ্যামলেন্দু। কী হল গৌতমের ? এত দেরি করছে কেন ? কান পেতে শুনল, নীচের তলা থেকে গৌতমের কোনও কথা শোনা যায় কি না। শোনা গেল না। গৌতম কেন, কারওর কথাই শোনা গেল না। ঘড়ির সঙ্গে সঙ্গে এ-বাড়ির সব কথাবার্তা যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে।

আর অপেক্ষা না করে শ্যামলেন্দু উঠে দাঁড়াল। নীচের তলায় গিয়ে সে নিজেই গৌতমকে ডেকে আনবে। এ-ঘরে গৌতমকে এনে দেখাবে যে, ঘড়িটা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে এবং সমস্ত অন্ধ-ধারণাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে এ-বাড়ির সবাই সুস্থ এবং স্বাভাবিক আছে।

দোতলার সিঁড়িটা লম্বা একটানা নীচে নেমে গেছে। সিঁড়ির মুখে কোনও আলো নেই, অন্ধকারাচ্ছন্ন। শ্যামলেন্দু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে যাবে, টের পেল, তার পায়ের সামনে দিয়ে কী যেন চলে যাচ্ছে। কুকুর ? নাকি বেড়াল ? নাকি কোনও বিষধর সাপ ? গ্রাম-গঞ্জের এ-সব পুরনো বাড়িতে সাপ থাকা বিচিত্র কিছু নয়। কথাটা মনে হতেই শ্যামলেন্দু ভীষণভাবে চমকে উঠে জিনিসটাকে ডিঙিয়ে সিঁড়িতে পা ফেলতে গেল। কিন্তু পিছলে গেল পা। একটা আর্তনাদ করে শ্যামলেন্দু গড়িয়ে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

শব্দ পেয়েই গৌতম ছুটে এল। কাকা, কাকিমা, এ-বাড়ির অন্য সব লোকও ছুটে এল। সিঁড়ির শেষ ধাপের নীচে শ্যামলেন্দুর রক্তাপ্লুত অচেতন দেহটা পড়ে আছে।

হেলথ সেন্টারের ডাক্তারবাবুকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনা হল। কিন্তু তখন সব শেষ। গম্ভীর মুখে স্টেথোস্কোপটা পকেটে রেখে ডাক্তারবাবু বললেন, "উইক হার্ট আর সাডেন শক, নইলে এত তাড়াতাড়ি মারা যেতেন না ভদ্রলোক।"

ঘড়িটা তখন অমোঘ নিয়তির মতো বন্ধ হয়ে ছিল দোতলার ঘরে।

ছবি : দেবাশিস দেব

আচ্ছা, কাচবার পর আপনার কাপড় জামা ঠিক ধবধবে সাদা হয় কি?

"আমি তো সেরা ডিটারজেন্টে পরিষ্কার করেই কাচি... কিন্তু ধবধবে সাদা কি হয়?"

"এ ব্যাপারে আমি কিন্তু সামান্য একটু বেশি নজর দিই।

রবিনে ডুবিয়ে ধবধবে সাদা করে নিই।"

আপনার মতো আমিও বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট দিয়েই কাপড় কাচি–কিন্তু শুধু ডিটারজেন্টে ঠিক যেন ধবধবে সাদা হয় না।

তাই তো রবিন ফেব্রিক হোয়াইটনারে একবার ডুবিয়ে সত্যিকারের সাদা করে কাচা শুরু করলাম।

রবিন কাপড় চোপড় ধবধবে সাদা করার উপাদান। এতে তেমন কোন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য নেই যা আপনার কাপড়ের রং জ্বলিয়ে ক্ষতি করতে পারে।

রোজ কাপড় ধোবার পর রবিনে ডোবালে দেখবেন দিনে দিনে ধবধবে ভাবটা বেড়েই চলেছে। আর আপনার কাপড় জামা বা হাতেরও কোন ক্ষতি হবে না।

জামা কাপড় যেমন কাচেন, তেমনিই কাচুন। শুধু কাচবার পর একবার রবিন ফেব্রিক হোয়াইটনারে ডুবিয়ে নিন। দেখবেন কি ধবধবে সাদা হয়ে গেল। আর পাঁচজনে দেখলে ভাববে, বাঃ! কাচবার পর কি যত্ন নিয়ে সাদা করা।

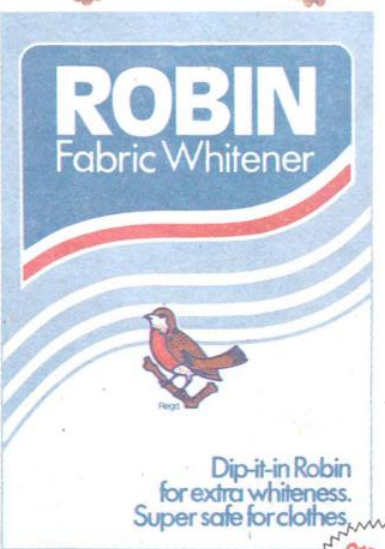

রবিন
ফেব্রিক হোয়াইটনার

এখন পাবেন সুবিধাজনক স্যাশেতে!

কাপড় জামা একবার ডোবালেই ধবধবে সাদা, সম্পূর্ণ নিরাপদ!

CLARION C-RCR-1

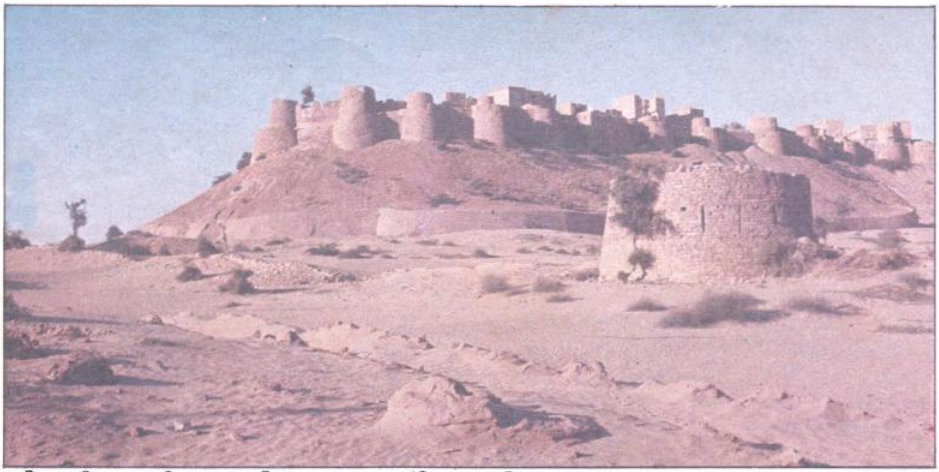

অতীতের ইতিহাস বুকে নিয়ে ঝকঝকে নীল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল কেল্লা

সোনার কেল্লার শহরে

অশোককুমার মিত্র

রাজধানী লোদুরভা ছেড়ে ভট্টিরাজ রাওল জয়শোয়াল এসেছিলেন শিকারে আট ক্রোশ দূরের জঙ্গলে ঘেরা পাহাড় ত্রিকূটে। চারদিকের ধুধু মরুভূমির মাঝখানে সবুজ পাহাড়। বিস্তর শিকার পাওয়া যায় সে জঙ্গলে। শিকারের খোঁজে রাজা হাজির হলেন এক ঝরনার নীচে। অবাক হয়ে রাজা দেখলেন সেখানে দুর্দান্ত এক বাঘের সঙ্গে পরম নিশ্চিন্তে জল খাচ্ছে এক নিরীহ ছাগ-শিশু। রাজা ভাবলেন এমন সুন্দর জায়গা, নিশ্চয়ই এখানে ভগবানের আশীর্বাদ ছড়ানো আছে। শিকার খেলা বন্ধ করে রাজা ফিরে গেলেন। লোদুরভা থেকে রাজধানী তুলে আনলেন ত্রিকূট পাহাড়ে। পাহাড় ঘিরে তৈরি হল সুদৃঢ় প্রাচীর ; ভেতরে কেল্লা, রাজপ্রাসাদ, পাত্র-মিত্রদের বাসগৃহ, প্রজাদের আস্তানা, আর সেই আশ্চর্য ঝরনাতলায় হল তাঁর দরবার। না, কোনও দেওয়ালের আড়াল নয়, ছাদের আচ্ছাদন নয়, মুক্ত আকাশের নীচে বসল রাজার মেঘ-দরবার।

আটশো বছরের পুরনো ইতিহাসের গল্প শোনাচ্ছিলেন নরেন্দ্র সিং। আমি আর শিবেন চলেছি মরুভূমির দেশ জয়শল্মিরে। যোধপুর থেকেই মরুভূমির শুরু। ধুধু রুক্ষ মরু প্রান্তরে মাঝে-মাঝে কাঁটাঝোপ। আগে পোকরান পর্যন্ত রেলপথ ছিল, এখন তা জয়শল্মির অবধি এগিয়ে এসেছে। মোটর চলার পথ অবশ্য আগেই তৈরি হয়েছিল। আমাদের এদিকে যেমন নানা কাজে গোরুর ব্যবহার, ওখানে তেমনি উট মোট বইছে, গাড়ি টানছে, লাঙলে খেত চষছে, যাত্রী নিয়ে দূরের মরুপথ পাড়ি দিচ্ছে !

নরেন্দ্র সিং জয়শল্মিরের লোক। সরকারি কাজ করেন। চমৎকার গল্প-বলিয়ে। বললেন, "জানেন, আমাদের দোকানঘরের দরজা লাগানো হয় পসরা সাজাবার পর, কখনও-কখনও আরও দেরি হয়ে যায়। চুরি যাবার ভয় তো নেই, শুধু ধুলোবালির হাত থেকে বাঁচতেই দরজা লাগানো, আর আমাদের এদিককার লোকেরা বড় ঘুমকাতুরে। পশু চরানো এখানে প্রধান জীবিকা। যারা ভেড়া ছাগলের পাল নিয়ে চরাতে বেরোয়, মাঠে ওদের ছেড়ে দিয়ে তারা গাছের ছায়া খুঁজে তোফা ঘুম জুড়ে দেয়। শহরের দোকানিদেরও

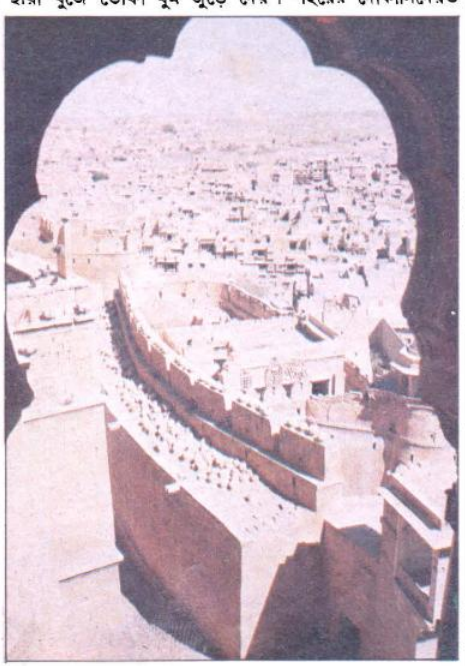

কেল্লার ভিতর থেকে বাইরের পৃথিবী

দুপুরের আসল কাজ জমাটি ঘুম।"

গু-গা-বা-বা সিনেমার ছবি তুলতে এসে সত্যজিৎ রায় দেখেছিলেন, দোকানের পাল্লা খুলে দোকানি কেমন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দোকানের পর দোকানে এমন দৃশ্য দেখে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন ঘুমের শহর।

অবশ্য শহরের সেই 'ঘুম-ঘুম' ভাবটা এতদিনে অনেকখানি কেটে গেছে। বাইরের অনেক মানুষ জড়ো হয়েছেন এখানে। ও·এন·জি·সি'র কল্যাণে শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠছে, ইস্কুল-কলেজ বসেছে। পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি বলে সেনা চলাচল বেড়েছে, আর বেড়েছে আমাদের মতো মরসুমি ট্যুরিস্টের দল।

স্টেশন চত্বরেই চায়ের দোকানে দেখা হল যোধপুরে পরিচিত ব্রিটিশ ভাইবোনের সঙ্গে। ব্রাউন ছোট ভাই, সে সবে ইস্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে। দিদি অ্যান ইস্কুলে পড়ায়। কলেজের ছুটিতে আই·সি·আই·কোম্পানিতে কিছুদিন কাজ করে কটা টাকা জমিয়েছে ব্রাউন। সেই টাকা আর দিদির সঞ্চিত পুঁজি নিয়ে তারা ভারত-দর্শনে বেরিয়েছে। গত বছরেও ওরা ভারতবর্ষে এসেছিল, তবে কলকাতায় আসেনি। সময় আর পয়সাকড়ি থাকলে এবারে আসবে। শহরে যাওয়ার জন্যে আমরা গাড়ির খোঁজ করছি, দেখি, দুটো সাইকেল ভাড়া করে ওরা বেরিয়ে পড়েছে। এখানে যে ঘন্টা হিসেবে সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়, এ-খবর ওরা আগেই জোগাড় করেছিল।

বহু বিদেশী মানুষ রাজস্থানে বেড়াতে আসেন। তাঁরা যেমন আসেন বিভিন্ন দেশ থেকে, তাঁদের পেশাও তেমনি বিচিত্র। কেউ শিল্পী, কেউ ইঞ্জিন-ড্রাইভার। ছাত্র অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ার কেরানি, এমনকী হিপি-দলের দেখাও পেয়েছি এবারে। এক জাপানি শিল্পী দম্পতি ও সাত ফুট দীর্ঘ এক জার্মান ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে দেখেছিলাম ইস্রায়েলি অধ্যাপিকার শিল্প-আলোচনা আগ্রহ ভরে শুনতে। ভদ্রমহিলা ভারতীয় স্থাপত্য ও শিল্পে ইসলামি রীতির প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করছেন। সে কারণে বেশ কয়েকবার এ দেশে এসেছেন। আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে ভদ্রমহিলা উদাহরণ দিয়ে চমৎকারভাবে বোঝাচ্ছিলেন ইসলামি শিল্পরীতির কথা।

বাইরের মানুষের ভিড় এখন মরু-শহর জয়শল্মিরে। আমাদের সঙ্গী-গাইড ডন মাত্র বছর দেড়েক হল স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাশ করে এখানে এসেছে জীবিকার সন্ধানে। '৭১-এর পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে এই সিন্ধি ছেলেটি সীমান্ত পেরিয়ে কাছের শহর বাড়মের-এ আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে ইস্কুলের পড়া শেষ করে ও এখন এ-শহরে গাইডের কাজ করছে। বেশ সপ্রতিভ ছেলে। ইংরেজি ভাল বলে। নানা মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় বুদ্ধিতে পালিশ লেগেছে। রেল-স্টেশন থেকেই আমাদের ভার ওর ওপরে ছেড়ে দিয়েছি; শহরে থাকার আস্তানা ঠিক করবার, কেল্লা-শহর, দূর মরু-অভ্যন্তর দেখাবার দায় তার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

রেলস্টেশন থেকে জয়শল্মির শহরের দূরত্ব দু' কি· মি·। শুনেছিলাম শহরে যাওয়ার বাসের ব্যবস্থা আছে। আমরা অবশ্য যাওয়া-আসা কোনও পথেই তার দেখা পাইনি। মাথা-পিছু তিন টাকা হিসেবে আমরা একটা স্টেশন-ওয়াগান ভাড়া করলাম। সামান্য পথ এগোতেই প্রান্তরের ওপারে পাহাড়ের চুড়োয় ঝলমলিয়ে উঠল সোনার কেল্লা। সত্যজিৎ রায়ের দেওয়া এই নামেই দেশী-বিদেশী সকলের কাছেই জয়শল্মির ফোর্ট এখন পরিচিত। হলুদ বালিপাথরে তৈরি দুর্গের প্রাকার, তোরণ, দরবার, প্রাসাদ, কেল্লা—শুধু কেল্লাই নয়, কেল্লার বাইরে আধুনিক শহর, নতুন রাজবাড়ি, হাভেলি সবই ওই ইয়োলো স্যাণ্ড স্টোনে তৈরি। এসব বাড়ি শুধু হলুদ পাথরে তৈরি নয়, তাতে রয়েছে একই ধরনের মিনে-করা পাথর, পাথরের জালি খোদাই। পৌরসভার নির্দেশ, নতুন বাড়িতে, অন্তত তার অলিন্দে সাবেকি পাথুরে-জালির কাজ বজায় রেখে জয়শল্মিরের বৈশিষ্ট্য যেন টিকিয়ে রাখা হয়।

বোর্ডিং-হাউসে পৌঁছে অল্পক্ষণের ভেতর কেল্লা আর শহর দেখবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। বাজারের ভেতর দিয়ে একটু এগিয়ে পথ ঠেকেছে কেল্লার দরজায়। ৭৬ মিটার উঁচু ত্রিকূট পাহাড়ের ওপরে দুর্গ। পাহাড় ঘিরে দীর্ঘ প্রাচীর, কোনও পরিখা নেই। রাজস্থানের কোনও দুর্গেই পরিখার বাধা দেখিনি। অবশ্য খাড়া ও প্রাচীর ডিঙিয়ে শক্তিশালী রাজপুতদের কাবু করা সহজ কাজ ছিল না, তার ওপর জয়শল্মির দুর্গ আবার মরুভূমির মধ্যিখানে। এখানে আক্রমণশানানো খুব একটা লাভজনকও ছিল না। তাই জয়শোয়ালের মরূদ্যানে—হ্যাঁ ওই নামেই জয়শল্মির পরিচিত ছিল সেকালের পশ্চিম এশিয়ার ভ্রমণার্থীদের কাছে। দীর্ঘ মরুপথে তাঁরা এখানে যাত্রাভঙ্গ করে বিশ্রাম নিতেন। আমাদের অভিজ্ঞতায়ও জয়শল্মির এক মরূদ্যান। এখানে বোতাম ঘোরালে ঝরনার জল, সুইচ টিপলে বিদ্যুৎ-আলো, শীতল বাতাস।

দুর্গের মূল দরওয়াজা পেরিয়ে সূরজ পোল বা সূর্যতোরণ। কেল্লাকে আরও সুরক্ষিত করবার জন্য পরবর্তী কালে নির্মিত। সূরজ পোল পেরিয়ে সাততলা পাথরের পরে পাথর সাজিয়ে তৈরি। ছাদেও মস্ত-মস্ত পাথরের টুকরো পাতা। আর সে ছাদের সিলিং-এ নানা কারুকাজ করা, প্রাসাদের বাইরে খোলা আকাশের নীচে মেঘ-দরবার, সেই বিখ্যাত 'হল অব ক্লাউডস'। পাথরের ঢালে গ্যালারির মতো সারি সারি আসন পাতা। তার মধ্যে শ্বেতপাথরে তৈরি আসনটি রাজার জন্য নির্দিষ্ট। পদমর্যাদা অনুসারে অমাত্য ও পারিষদদের আসনও চিহ্নিত। একেবারে নীচের মেঝে সাধারণ প্রজাদের। ওই আসনে বসে রাজা মন্ত্রণা করতেন, বিচার করতেন, আবার প্রজাদের দর্শনও দিতেন। আমরা দেখলাম কোত্থেকে একটা ময়ূর উড়ে এসে বেশ জাঁকিয়ে রাজার আসনে বসল। কিছুক্ষণ বসে থেকে ফের কোথায় উড়ে চলে গেল। রাজস্থানে, বিশেষত জয়শল্মিরে যত্রতত্র অজস্র ময়ূর দেখা যায়।

মেঘ-দরবারের বাঁ দিক ধরে কিছুটা এগোলে সূর্যমন্দির। ভট্টি রাজারা ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু। সূর্য তাঁদের আরাধ্য দেবতা। তবে অন্য ধর্মের প্রতি রাজাদের মনোভাব সহমর্মিতার। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবসায়ীরা জৈন মন্দির গড়েছেন কেল্লার অভ্যন্তরে, শহরে পাঁচতলা তাজিয়া মিনার বসিয়েছেন মুসলমান বণিকেরা।

প্রাসাদের বিপরীত প্রান্তে রয়েছে দুর্গনগরী, রাজপুরুষ ও সাধারণ প্রজার বাসগৃহ। সে-সব বাসগৃহ এখন পরিত্যক্ত। নতুন রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছে সমতলে, দুর্গ-প্রাকারের বাইরে। অর্থবান ব্যবসায়ী ও অন্য মানুষেরাও জাঁকিয়ে বসেছেন নতুন শহরে। দুর্গের উপরের একটি অংশ থেকে

শহরের দৃশ্য বড় মনোরম দেখায়। দুর্গ-প্রাকারের গা ঘেঁষে পাহাড় বেয়ে পথটি মূল দরওয়াজার দিকে গিয়েছে। ওই পথেই আমরা কেল্লায় ঢুকেছি। উপরে উঠে দেখি দুর্গ-প্রাকারে থরে-থরে সাজানো রয়েছে অজস্র পাথুরে গোলা। পাঁচ নম্বর ফুটবলের আকারের সে-সব গোলা ওপর থেকে গড়িয়ে দিয়ে আগুয়ান শত্রুদলকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা অসম্ভব নয়। আধুনিক কামানের পাশে সেকালের পাথুরে অস্ত্র দেখে চমৎকৃত হলাম।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে শহরের প্রধান পথে পা বাড়ালাম। পিচের তৈরি মসৃণ সড়ক চলে গেছে পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত। অন্য সব পথ পাথরে বাঁধানো। তেমনি এক পথ ধরে এলাম সেলিম সিং-কি হাভেলিতে। শহরের দর্শনীয় আরও দুই হাভেলি, পাটোয়ান-কি-হাভেলি ও নাথমল-কি হাভেলি। এই তিন হাভেলিই চমৎকার কারুকাজ-করা হলুদ পাথরে তৈরি সেকেলে ধনীদের প্রাসাদ। দেওয়াল, দরজা ও জাফরিতে নকশার মিল চোখ জুড়িয়ে দেয়।

সেলিম সিং-কি হাভেলিতে পরিচয় হল মরিগানের সঙ্গে। তরুণ ফরাসি শিক্ষক। কয়েকবারই ভারত ঘুরে গেছেন, তবু ভারত দর্শনের টান বাড়ছে দিনে দিনে। স্যাণ্ডউইনে যাওয়ার জন্যে আমরা কজন সঙ্গী খুঁজছিলাম, উদ্দেশ্য গাড়ি-ভাড়াটা ভাগ করে নেওয়া। মরিগানকে সে-কথা বলতে রাজি হয়ে গেল। আরও ক' জন সঙ্গী সংগ্রহের চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি তাঁর হোটেলে চলে গেলেন। ঠিক হল, বেলা তিনটে নাগাদ তিনি আমাদের বোর্ডিং হাউসে আসবেন।

আমরা রাজস্থান ঘুরছিলাম জুলাই মাসের চতুর্থ সপ্তাহে, কেতাবি হিসেবে সময়টা ওদেশ ভ্রমণের পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। তবু আশ্চর্য, মেঘের ছাতার আড়ালে আমাদের বেড়ানোটা বেশ আরামেই শেষ হল।

দুপুরের খাওয়ার শেষে আমরা যখন একটু গড়িয়ে নেবার উদ্যোগ করছি, ঠিক তখনই মরিগান এসে হাজির। ঘড়িতে দেখি কাঁটায় কাঁটায় তিনটে। এ সময়ানুবর্তিতা সত্যিই দেখবার জিনিস। মরিগান অবশ্য কোনও সঙ্গী আনতে পারেননি। ডন গাড়ি নিয়ে এলে আমরা তিন যাত্রীই চললাম।

মরুভূমির মাঝে কোথাও-কোথাও এমন বালির পাহাড় তৈরি হয়ে যায়। ধুধু মরু-প্রান্তরে জমে ওঠে দুশো আড়াইশো ফুট বালির স্তূপ। পাকিস্তান সীমান্ত-সড়ক ধরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কি.মি পথ যেতে হবে ওই বালির পাহাড় দেখতে। শহর ছাড়িয়ে দেখা গেল মূল সাগর—রাজার অবসর-বিনোদন গৃহ আর জলাধার। এখান থেকে গাড়ি সোজা চলল বালি-পাহাড়ের দিকে। যত এগোচ্ছি, তত বাতাসের বেগ বাড়ছে। ক্রমে তা ঝড়ের চেহারা নিল। বালি উড়ে এসে জমছে গাড়ি চলার পথে। সে পথ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। পূর্ত বিভাগের লোকজন দ্রুতহাতে সে বালি সাফ করে মোটর-চলাচল অব্যাহত রাখছেন।

ডন জানাল, মাঘী-পূর্ণিমার সময় আমরা যদি আবার আসতে পারি তবে এমন জিনিস আমরা দেখতে পাব, যার জুড়ি আর কোথাও মিলবে না। ওই সময়ে এখানে বসে মরু-মেলা। তখন এখানকার রূপ একেবারে বদলে যায়। তিনদিনের এই মেলায় কত দেশের মানুষ যে আসেন! লোক-

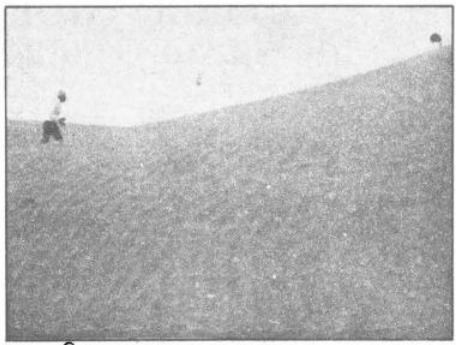

ঝুরো বালির মধ্যে ডুবে যায় পায়ের পাতা

সঙ্গীত আর নৃত্যের আসরে পুরনো রাজস্থান যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। পুরুষ ও মহিলারা আসেন খাঁটি রাজস্থানি পোশাকে। মেলার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে সমবেত উটের নাচ আর উটের পিঠে চড়ে পোলো খেলা। অমন বিশাল ও ল্যাগবেগে ঠ্যাং নিয়ে উটেরা কীভাবে সমবেত নৃত্য করে থাকে কল্পনায় সে দৃশ্য ধরবার চেষ্টা করতে করতে আমরা বালির পাহাড়ে পৌঁছে গেলাম। মরুভূমির মাঝে বালি জমে জমে পাহাড় গড়ে উঠেছে। গাড়ি ছেড়ে আমরা তিনজনে পাহাড়ের দিকে এগোলাম। কিছুটা এগোতেই এক উটওয়ালা এসে হাজির। সব কিছুতেই শিবেনের উৎসাহ। এ দেশে এসে মরুভূমির জাহাজে না চাপবার কোনও অর্থ হয়? দরাদরি করে ও উট-ভ্রমণের ব্যবস্থা করে ফেলল। এখানে অবশ্য অনেকেই 'ক্যামেল সাফারি'তে বেরিয়ে পড়েন মরুভূমির পথে। তিনদিনে কেউ কেউ পাড়ি দেন বিকানির পর্যন্ত। উটের পিঠে দিনরাত্তির কাটানো ও মরুপথ অতিক্রমের অভিজ্ঞতায় তাঁদের ঝুলি ভরে নেন। আমরা অবশ্য সে মেজাজ নিয়ে আসিনি, দু'চক্কর ঘুরেই নেমে পড়লাম।

এবারে বালি-পাহাড়ের পথ, চড়াই ভেঙে যত উঠছি বাতাসের বেগ তত প্রবল হয়ে উঠছে, ঝোড়ো হাওয়ায় চুল, কপালে ঝাঁপিয়ে পড়ে দৃষ্টি আড়াল করে দিচ্ছে। ঝুরো বালিতে পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে। বাতাসের দিকে পিছন ফিরে দেখছি ঝড়ে প্রতি মুহূর্তে বালির বুকে নতুন আলপনা আঁকা হচ্ছে। ধীরে-ধীরে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চুড়োয় গিয়ে পৌঁছলাম। ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার অজস্র পাহাড় ঢেউয়ের মতো তিন পাশে ছড়ানো। আমরা সুবিধেমতো একটা জায়গা বেছে বসলাম। এতক্ষণে আরও দু-একটি যাত্রী-গাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছে। ঘড়ির কাঁটা সাতটা পেরিয়ে গেলেও সূর্যের আলোয় দূরের বালি চিকচিক করছে।

ক্রমশ আকাশে রং বদলের পালা শুরু হল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বলয়রেখায় সূর্যাস্তের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। লাল সিঁদুর ছড়িয়ে গেল আকাশে, তার মাঝে সোনালি আভা। একটু পরে আকাশে বেগুনির ছোপ লাগল। ক্রমে গাঢ় হতে হতে তা আঁধারে ঢেকে গেল। আমরা অন্ধকারে ধীরে ধীরে বালির পাহাড় ভেঙে নীচে নামতে শুরু করলাম।

লাক্মে কসমেটিক সাবান
বিশেষ ত্বক মোলায়েমের অয়েলে সমৃদ্ধ

ত্বকের স্বপ্নময় লাবণ্যের জন্য.

অনুভব করুন অঙ্গ ঘিরে লাক্মে কসমেটিকের ক্রীমেভরা ফেনা. নিজেই বুঝবেন সুরভিত এই ফেনার জাতই আলাদা।

এইতো ত্বককে মোলায়েম করা বিশেষ তেলের আদরভরা পরশ, যা আপনার ত্বককে করে তোলে পেলবকোমল, লাবণ্যে ঢলঢল।

লাক্মে কসমেটিক সাবান।
প্রতি রমণীর কমনীয় ত্বকের স্বপ্ন

Lakmé

সেকালের সেরা জীব

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পঞ্চাশ কোটি বছর আগের পৃথিবীটা কোনও মন্ত্রবলে আজ যদি আমরা দেখতে পেতাম ! কী দেখতাম তা হলে ? যতদূর দৃষ্টি যায়, চারদিকে মরুভূমির মতো ধু-ধু করছে আঢাকা স্থলদেশ। খাঁখাঁ করা সেই শিলাময় ডাঙায় না আছে অরণ্য, না কোনও তৃণলতা। কোথাও সবুজের কোনও চিহ্ন নেই। না আছে জীব, না জন্তু। ডাঙায় এমন কিছু নেই যার মধ্যে জীবন আছে।

ডাঙা ছেড়ে জলের দিকে তাকাও। একদম অন্য ছবি।

সমুদ্রের মধ্যে গিজগিজ করছে খুদে-খুদে অসংখ্য প্রাণী। জলের মধ্যে থইথই করছে অদৃশ্যপ্রায় সব সূক্ষ্ম আকারের লতাপাতা আর জলজ আগাছা। এ-কালের গাছপালার মতোই সূর্যের আলো ছাড়া তাদের চলত না। জল আর হাওয়া থেকে তারা পেত বাঁচার রসদ। বলা যায়, এরা ছিল একরকমের সামুদ্রিক ঘাস পাতা।

সেকেলে প্রাণীদের খোরাক ছিল এই ঘাসপাতা আর সেইসঙ্গে ঘাসপাতা-খাওয়া প্রাণী।

সমুদ্রে তখন গিজগিজ করছে নানা প্রাণী। শামুক গুগ্‌লি তারামাছ ধরনের রকমারি জীব আর অসংখ্য জলের পোকা।

এদের সবার ওপর টেক্কা দিয়েছিল সেকালের চিংড়িজাতীয় এক প্রাণী। ট্রাইলোবাইট। জলের জীবের মধ্যে এরা ছিল সেরা। এদের মধ্যে যারা সাঁতরাতে পারত, তারা ওপর দিকে ভেসে বেড়াত। যারা পারত না, তারা জলের তলায় বালিতে গর্ত খুঁড়ে থাকত।

এ দুনিয়ায় বাসের পক্ষে
ছিল তখন
ট্রাইলোবাইট সেরা।
দেহের গড়ন ছিল এমন
করতে পারত
অবাধে ঘোরাফেরা।

ট্রাইলোবাইটের সন্তানসন্ততি হয় অনেক ; তাদের থেকে ক্রমে নতুন ধাঁচের প্রাণীও জন্মায়।

একটানা তিরিশ কোটি বছর চুটিয়ে রাজত্ব করবার পর ট্রাইলোবাইটের বংশ শেষপর্যন্ত পৃথিবী থেকে লোপ পায়।

এদেরই একটা গোষ্ঠী নিজেদের বদ্‌লে জলবিছা হয়ে যায়। এদের চোয়াল ছিল দারুণ শক্ত, জলের অন্য সব প্রাণীকে এরা খেয়ে ফেলতে থাকে। কোনও কোনও জলবিছা ন'ফুট লম্বা হত। ক্রমবিকাশের শেষ ধাপে পৌঁছে বিশ কোটি বছর পর এরাও লোপ পায়।

এদের দু'একটা জাত ডাঙায় ছিটকে পড়ে নিজেদের বদলে হয়ে যায় একদিকে স্থলচর বিছা, অন্যদিকে মাকড়সা আর ঘোড়ার পায়ের নালের মতো দেখতে একধরনের কাঁকড়া।

বৃহৎ চেহারার একটি ট্রাইলোবাইটের ফসিল

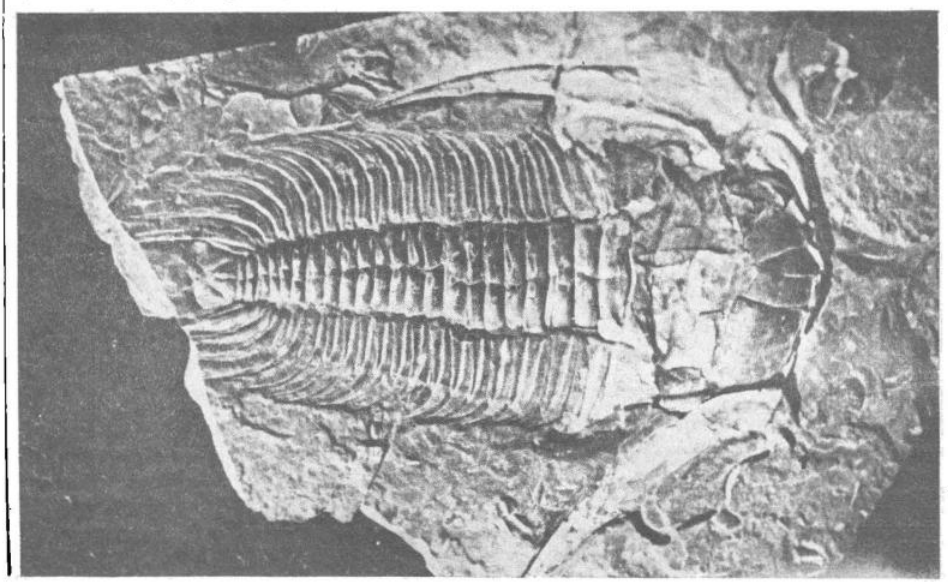

ওর দাঁতকে এখন থেকেই
সুরক্ষিত করে নিন
এই ফ্লোরাইড সংরক্ষণ ওকে
বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে করুন
Binaca®
Fluoride
toothpaste
দাঁতকে জীবনভর সঙ্গী ক'রে
নিতে হ'লে, দন্তছিদ্রের সংরক্ষণ করুন
আর, বিনাকা ফ্লোরাইড-এর ফ্লোরাইডই দেয়
ঐ অপরিহার্য সংরক্ষণ। কারণ, মুখের ভেতরের
ক্ষতিকর অ্যাসিড যখন দাঁতের তলার ভাগকে ঘিরে ফেলে, তখন
এই ফ্লোরাইড, দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে গিয়ে দন্তছিদ্র হওয়া রোধ
করে—আর, ফলে, প্রাথমিক অবস্থাতেই দন্তক্ষয় হওয়াও রোধ হয়।
তাই বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে, দন্তছিদ্র হওয়া বন্ধ করুন, দন্তক্ষয় রোধ করুন।
দাঁতে নব জীবনের সাড়া
বিনাকা ফ্লোরাইড
টুথপেস্ট
ভারতের সর্বপ্রথম ও প্রভাবশালী ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

BF-10-85-BENG

মুহূর্তের জন্য রক্তহীন হয়ে গেল মূষিকবাহনের মুখ···

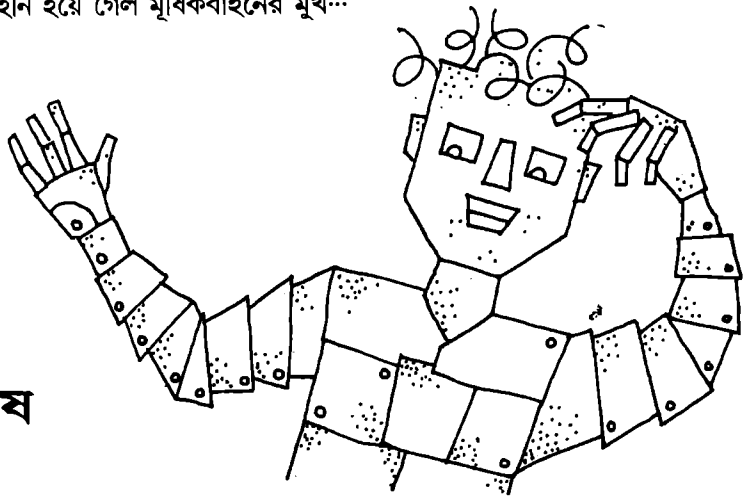

সাত্যকি সোমের সত্যান্বেষ

রেবন্ত গোস্বামী

টেলিফোনটা বেজে উঠতে একটু বিরক্ত-মুখেই সাত্যকি সোম রিসিভারটা ধরলেন। সকালে এই প্রাতরাশের সময়টুকুই তাঁর একটু আয়েস করার সময়। কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে হেলানো চেয়ারে কাত হয়ে তাঁর নিজের তৈরি রোবট নরোত্তমের সঙ্গে একটু গল্পগুজব করেন। আগে টেলিফোন এলে নরোত্তমই ধরে কথাবার্তা বলত। কিন্তু এখন নরোত্তমের মাথায় আটকানো কোন্ ক্যাপসুলের কানেকশন কখন ঢিলে হয়ে থাকে, কে জানে। 'ভদ্রতা' ঢিলে থাকলে তো টেলিফোন ধরেই বলে ফেলত, 'ডক্টর সোম এখন ব্যস্ত। কাজের কথা থাকলে বলে ফেলুন, রেকর্ড করে নিই। নইলে কেটে পড়ুন—মানে, লাইন কেটে দিন।' 'সহনশীলতা' ক্যাপসুল ঢিলে হলে রিসিভার তুলেই বলত, 'ওঃ, সাত-সকালেই ক্রিং ক্রিং, একটু শান্তিতে থাকতে দেবেন না, মশাই!' এসব দেখেশুনে সাত্যকি সোম টেলিফোনটা নরোত্তমের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে বলেছেন, 'যখন-তখন তোর মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে যায়। তোকে বিশ্বাস নেই।' শুনে নরোত্তম ম্লান হাসি হেসে বলেছিল, 'কর্তার যা ইচ্ছে। আমি পাগল-ছাগল রোবট, ওসব টেলিফোন-ফেলিফোন আমাকে দিয়ে না করানোই ভাল।' ডক্টর সোম মুচকি হেসে ভাবলেন, আর যাই হোক, 'অভিমান'-এর ক্যাপসুলটা বেশ টাইট্ই আছে দেখছি।

আজ অবশ্য নরোত্তমের সঙ্গে কথা জমছে না তেমন। নরোত্তমও আঁচ করতে পেরে তাঁকে বিরক্ত করছে না। দু'দিন হল ডক্টর সোমের মনটা বিষণ্ণ হয়ে আছে। তাঁর পরমপ্রিয় মেধাবী ছাত্র পরমভট্টারক উপাধ্যায় হঠাৎ হাসপাতালের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। কয়েকদিন আগে থেকে সে মাথার যন্ত্রণা অনুভব করছিল দেখে সাত্যকি সোমই তাকে বলেছিলেন, মস্তিষ্ক-বিশেষজ্ঞ ডক্টর মূষিকবাহন বটব্যালকে একবার দেখাতে। কিন্তু তার মাথা যে এতটা খারাপ হয়েছিল, সেটা তিনি একবারও বুঝতে পারেননি। আত্মহত্যা যে করে, সে মানসিক রোগগ্রস্ত ছাড়া আর কী? তার মৃত্যুর জন্যে সাত্যকি সোমের নিজেকে যেন দায়ী বলে মনে হয়। তাঁর কথাতেই তো পরমভট্টারক ডাক্তার বটব্যালের হাসপাতালে গিয়েছিল।

টেলিফোনটা ধরে ফোনোভিশনের সুইচটা টিপে দিলেন তিনি। এতে কে ফোন করছে তার ছবি পর্দায় দেখা যাবে। কিন্তু পর্দায় কোনও ছবি এল না। তার মানে যিনি ফোন করছেন, তিনি ট্রানস্ভিশনের সুইচ অফ্ করে রেখেছেন। কিন্তু ক্যানকেনে গলা শুনেই ডক্টর সোম বুঝতে পারেন, টেলিফোনের অন্য প্রান্তে কে আছে। একটু অবাক হলেন তিনি। পরমভট্টারকের ব্যাপারে এইমাত্র ডাক্তার বটব্যালের কথা তিনি ভাবছিলেন। নরোত্তমও বোধহয় বুঝতে পারল ফোনোভিশনে কোনও ছবি না আসাতে। জোরেই বলে উঠল, "মাথা-ফাটানো ডাক্তার নিশ্চয় স্যার?"

সর্বনাশ! ডক্টর বটব্যাল শুনতে পাবেন যে। নরোত্তমের আপত্তি সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি উঠে রোবটটার সুইচ অফ্ করে দিলেন তিনি।

মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মূষিকবাহন বটব্যালকে নরোত্তম মাথা-ফাটানো ডাক্তার বলে, কারণ তিনি রোজই প্রায় দু'একটা করে ব্রেন অপারেশন করেন। নরোত্তম অবশ্য বলে, যারা মাথা ফাটায়, সেইসব ডাকাত-গুণ্ডারাও নিজেদের চেহারা দেখাতে চায় না।

ডক্টর বটব্যালের অবশ্য নিজের চেহারা না দেখানোর অন্য কারণ আছে। তাঁর মতন কুৎসিত-দর্শন ব্যক্তি খুব কমই আছে। দু'বার প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখের চেহারা পালটে নিখুঁত হয়েছেন। আবার কিছুদিন পরেই যে-কে-সেই। দেখে বিখ্যাত প্লাস্টিক-সার্জন দেশরাজ জুনেজা অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'আপনার এই রোগটা তো অদ্ভুত। মনে হয় কুৎসিত ভাবটা রক্তের মধ্যেই আছে।' শুনে মুখটাকে আরও বিশ্রী করে মূষিকবাহন চলে এসে বলেছিলেন, দেশরাজকে দেশছাড়া না করলে তাঁর নাম মূষিকবাহন নয়।

সাত্যকি সোম কোনও অজ্ঞাত কারণে মৃষিকবাহনকে এড়িয়ে চলেন। তাঁর ওই দু'পাশে ছড়ানো দুটো চোখ দেখলে চতুষ্পদ জন্তুর কথা মনে পড়ে। কনুইয়ের পেছনে লোমের গোছা, অথচ মুখে দাড়ি-গোঁফের চিহ্নমাত্র নেই, এইসব যেন একটা অমানবিক ব্যাপার-স্যাপার বলে মনে হয়। নইলে অনেক আপাত-কুৎসিত লোকের সঙ্গে মিশে, কথা বলে আনন্দ পেয়েছেন।

যাই হোক, সাত্যকি সোম রিসিভারটা তুলে একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললেন, "সোম বলছি।"

ওপার থেকে ক্যানেস্তারা টিন উত্তর দিল, "আমি মৃষিকবাহন বলছি। আপনার কাছে কি বাড়তি যান্ত্রিক শ্রবণেন্দ্রিয় আর বাগেন্দ্রিয় আছে, ডক্টর সোম ? একটু ধার চাইতাম।"

সাত্যকি সোম একটু অবাক হলেন। রোবটের ব্রেনের সঙ্গে লাগানোর জন্যেই এগুলো তাঁর কাছে আছে। মানুষের বাক্‌শক্তি বা শ্রবণশক্তি হারালে তার অন্য ব্যবস্থা আছে। মস্তিষ্ক ছিদ্র করে তার সঙ্গে এই যন্ত্রগুলো যোগ করলে মূক-বধিররা শুনতে, কথা বলতে পারবে ঠিকই, কিন্তু এভাবে এই কৃত্রিম ইন্দ্রিয় বয়ে বেড়ানো শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, অসুবিধাজনকও।

সাত্যকি সোমের উত্তর দিতে একটু দেরি হল হয়তো। মৃষিকবাহন বুঝতে পেরে বললেন, "একটা অদ্ভুত গবেষণা করছি আমি। আপনার যন্ত্র দুটো নিয়ে চলে আসুন না। দেখে আপনি ইন্টারেস্ট পাবেন। আসছেন তো ? কখন, বলুন।"

সাত্যকি সোমের কাছ থেকে কথা আদায় করে মৃষিকবাহন টেলিফোন ছাড়লেন।

যন্ত্র দুটো হাতে নিয়ে বিকেলে ডক্টর বটব্যালের চেম্বারে হাজির হয়ে সাত্যকি দেখলেন বাইরে বোর্ড ঝুলছে, আজ রোগী দেখা বন্ধ। তাঁর আসবার জন্যে ডক্টর বটব্যাল রোগী দেখাই বন্ধ করে দিলেন এতে বেশ সঙ্কুচিত হলেন তিনি। ভেতরে ডক্টর বটব্যাল তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। ঢুকতেই দু'হাত দিয়ে স্বাগত জানালেন। তারপর বললেন, "আজ আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। আসুন ভেতরে ল্যাবরেটরিতে।"

ল্যাবরেটরি মানে মানুষের খুলি, হাড়, বয়ামের তরল পদার্থের মধ্যে সাজানো মস্তিষ্ক—এইসব। ডক্টর সোম কেন জানি এসব সহ্য করতে পারেন না। এগুলো দেখে জন্মগত একটা বিবমিষা আর ভীতি এসে তাঁর মনে ভর করে। তাঁর রোবটের শরীরের যন্ত্রপাতি খুললে তো এমন হয় না।

একটা কাচের জারের কাছে নিয়ে গিয়ে তার ভেতরে রাখা মস্তিষ্কটির দিকে আঙুল দেখিয়ে মৃষিকবাহন বললেন, "এই যে মস্তিষ্কটা দেখছেন, এটা জীবিত আছে। মানে, রক্তপ্রবাহ চালিয়ে ওটাকে আমি জীবিত রেখেছি। এখনও এটা চিন্তা করে চলেছে। এর ক্লান্তি নেই, ঘুম নেই, কারণ রক্তটাকে আমি সবসময়ই বিশুদ্ধ আর তাজা করে রাখছি।"

সাত্যকি সোম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মৃতদেহের থেকে মস্তিষ্ক নিয়ে তাকে বাঁচিয়ে ফেলা যায় ?"

মৃষিকবাহন বিশ্রীভাবে হেসে বললেন, "যায়। যদি সদ্যোমৃত হয়। আর সে-মৃত্যু যদি রোগে ভুগে না হয়।"

সাত্যকি সোম বললেন, "তার মানে বলছেন, দুর্ঘটনাজাতীয় কারণে মৃত্যু ? কিন্তু এ-বিষয়ে তো অনেক বিধিনিষেধ হয়েছে এখন। কৃত্রিমভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লাগিয়ে তাদের প্রায়ই স্বাভাবিকভাবে জীবিত করে ফেলা যায়। তাই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে আগের মতন চোখ ইত্যাদি তুলে নেওয়া এখন বেআইনি।"

মৃষিকবাহন আগের মতোই হেসে বললেন, "ঠিকই। তবে শারীরিক আঘাত একটা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তখন আর কিছু করার থাকে না। তখন নিষেধ নেই। এরও তাই হয়েছিল। গাড়ি শরীরের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছিল।"

কোনও এক অজানা নিহত ব্যক্তির জন্যে সাত্যকি সোমের মন করুণায় ভরে গেল। তিনি কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, "কিন্তু এই মস্তিষ্ক যে চিন্তা করছে, তার কী প্রমাণ আপনি পেয়েছেন ?"

মৃষিকবাহন হেসে বললেন, "প্রমাণের জন্যেই তো এই যন্ত্র দুটো আপনার কাছ থেকে নিলাম। মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ জায়গায় এই দুটো যোগ করে দেব। একটাতে ও শুনতে পাবে। একটাতে ও কথা বলার শক্তি পাবে। ও দুটো লাগিয়ে পরে আরেকদিন আপনাকে আসতে বলব। হাতেনাতে প্রমাণ পাবেন।" বলে দু'পাশে ছড়ানো চোখ দুটোকে যথাসম্ভব কাছাকাছি আনার চেষ্টা করে গর্বিত ভঙ্গিতে সাত্যকি সোমের দিকে তাকালেন মৃষিকবাহন।

সাত্যকি সোম বললেন, "তবে দর্শনেন্দ্রিয়টাই বা বাদ দিলেন কেন ? আমার কাছে যান্ত্রিক চোখও আছে, নেবেন ?"

যেন আঁতকে উঠেছেন, প্রথমে এমনভাবে 'না, না' করে উঠলেন মৃষিকবাহন। পরে আবার একটু চিন্তা করে বললেন, "ঠিক আছে, ওটাও একটা নিয়ে আসবেন সেদিন।"

দু'দিন পরেই মৃষিকবাহনের অনুরোধে সাত্যকি সোম আবার তাঁর চেম্বারে এলেন। মৃষিকবাহন যথারীতি তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "ও কথা শুনতে আর বলতে পারছে। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন। তবে একটা অনুরোধ, ওর মনে মৃত্যুর স্মৃতি জাগিয়ে তুলবেন না। নামধাম জিজ্ঞেস করবেন না। কথা দিন।"

প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাত্যকি সোম ভেতরে এলেন। মৃষিকবাহনের হাতে যান্ত্রিক চোখ জোড়া দিলে তিনি সেটাকে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। তারপর সুইচ টিপে মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত যন্ত্র দুটো চালু করে দিলেন মৃষিকবাহন।

তারপর তাঁর ইঙ্গিতে সাত্যকি সোম প্রশ্ন করে চলেন।

প্রথম প্রশ্ন, "আপনি এখন কোথায় ?"

নিখুঁত যান্ত্রিক বাগযন্ত্র সুকণ্ঠে বলে উঠল, "জানি না। চারদিক অন্ধকার। আমি মৃত ? নাকি স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু স্বপ্নে তো এত পরিষ্কার চিন্তাশক্তি থাকে না। আমি সব পরিষ্কার ভাবতে পারছি। বেঁচে থাকলে, জেগে থাকলে মানুষ এরকম ভাবতে পারে। তার মানে আমি বেঁচে আছি। দেকার্ত বলেছেন, আমি চিন্তা করছি, অতএব আমি বেঁচে আছি। এই তো সব মনে আছে। পরপর মোগল সম্রাটের তালিকা, বাবর হুমায়ুন আকবর জাহাঙ্গির শাহ্‌জাহান ঔরঙ্গজেব। আমরা বলতাম, বাবার হইল আবার জ্বর, সারিল ঔষধে।" বলে ছোটছেলের মতো হেসে উঠল মস্তিষ্কটা। তারপর গম্ভীর ভাবে বলে চলল, "এ টু-দি পাওয়ার জিরো ইজ ইকোয়াল-টু ওয়ান। ই সমান এম-সি-স্কয়ার···"

বিস্ময়ভরা চোখে ডক্টর সোম মূষিকবাহনের দিকে তাকালেন। মূষিকবাহনের চোখেও একটা বিস্ময় ফুটে উঠেছে। বিস্ময়, না ভয় ? তাঁর চতুষ্পদসুলভ চোখ দুটোতে সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

সাত্যকি সোম কোনও রকমে আরেকটা প্রশ্ন করলেন। "চিন্তাশক্তি ছাড়া শারীরিক অনুভূতি আপনার কেমন হচ্ছে ?"

উত্তর হল : "কিছু বুঝছি না। শুধু মাথায় একটা ব্যথা। ৯৩ দিয়ে মাথা টিপতে পারছি না। হাত পা সব অবশ।" বলেই হঠাৎ উলটে প্রশ্ন করল মস্তিষ্ক, "আপনি প্রশ্ন করছেন ? আপনি কি যমদূত ? নাকি ডক্টর বটব্যাল, আমাকে অজ্ঞান করে প্রশ্ন করছেন ?"

প্রচণ্ড চমকে উঠে ডক্টর বটব্যাল যন্ত্র দুটোর সুইচ বন্ধ করে দিলেন। অবাক সাত্যকি সোমও কম হননি। লোকটা জানল কী করে যে, ডক্টর বটব্যাল এখানে আছেন ?

ডক্টর সোমকে প্রায় ঠেলে নিয়েই বাইরের ঘরে এলেন মূষিকবাহন। অ্যাসিস্ট্যান্ট দু'কাপ কফি নিয়ে এল। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ডক্টর বটব্যাল বললেন, "আমি মাঝে-মাঝে ওভাবে চিকিৎসা করি ঠিকই। কিন্তু লোকটা জানল কী করে ? হয়তো ও জীবিত থাকতে কোনও দিন আমি ওর চিকিৎসা করেছিলাম। অসম্ভব কিছু নয়।"

সাত্যকি সোমকে প্রায় নীরসভাবে বিদায় দিলেন তিনি। মস্তিষ্কের কথায় মূষিকবাহনের নামের উল্লেখ আর তাতে মূষিকবাহনের এতটা ভাবান্তর, দুটোই সাত্যকি সোমের কাছে অস্বাভাবিক লাগল।

দু'দিন ধরে নানারকম চিন্তা করলেন তিনি। তৃতীয় দিন ড্রয়ার খুলে কিছু বার করতে গিয়ে তাঁর নজরে পড়ল, যান্ত্রিক চোখের পরকলা দুটো এখানেই পড়ে আছে। চোখে লাগানো হয়নি। কিন্তু কই, এ ব্যাপারে মূষিকবাহন তো তাঁকে কিছু জানালেন না। তবে কি তিনি চোখ দুটো এখনও মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগ করেননি ? তাঁর মতন গবেষকের এ-কাজটা এত সময়ের মধ্যে না-করাটা ডক্টর সোমের কাছে বিস্ময়কর লাগল।

সেদিনই মূষিকবাহনের চেম্বার বন্ধ হওয়ার সময়ের একটু আগে নিজে থেকেই তিনি সেখানে এলেন। পরকলা দুটো ছাড়া অন্য একটা যন্ত্রও তিনি সঙ্গে নিলেন। ডাক্তার শেষ রোগীটিকে দেখছিলেন। সহকারীর কাছে খবর পেয়ে বেশ বিরক্ত হয়েই যেন বললেন, "বসতে বলো। এ এক ঝামেলা হল দেখছি।" বাইরে থেকেই স্পষ্ট শুনতে পেলেন সাত্যকি সোম।

রোগী দেখা শেষ করে মূষিকবাহন বেরিয়ে এসে কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, "কী ব্যাপার ? এত সৌভাগ্য আমার, না বলতেই এলেন !"

সাত্যকি সোম বললেন, "সেদিন যান্ত্রিক চোখের সঙ্গে লেন্স দুটো দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি বোধহয় চোখ দুটোর কানেকশন করেননি এখনও, তাই জানতে পারেননি। দিন, লেন্স দুটো লাগিয়ে দিই।"

চোখ দুটো মস্তিষ্কের কাছে টেবিলেই পড়ে ছিল। চোখে লেন্স দুটো লাগাতে লাগাতে সাত্যকি সোম বললেন, "ডক্টর বটব্যাল, দয়া করে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্টকে এক গ্লাস জল দিতে বলবেন ?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়," বলতে বলতে মূষিকবাহন পাশের ঘরে গেলেন। একটু পরে নিজেই এক গ্লাস জল নিয়ে এলেন। জল খেয়ে সাত্যকি সোম বললেন, "ধন্যবাদ। এখন যাই।"

তাঁর নিজের জন্যে সাত্যকি সোম কষ্ট করে এলেন, এতে বেশ সঙ্কুচিত হলেন মূষিকবাহন। ভুল বুঝে তাঁকে তেমনভাবে অভ্যর্থনা করা হয়নি, এই কারণে এবারে সত্যিই লজ্জিত হলেন তিনি। বিদায় জানানোর সময় তাঁর কুৎসিত মুখেও সেই লজ্জা ধরা পড়ল।

বাড়ি ফিরে এসে ল্যাবরেটরিতে টিভিডিও যন্ত্রটার সঙ্গে যুক্ত সংকেতবাঁশিটা ঠিকমতো কাজ করছে কি না, সেটা দেখে নিলেন সাত্যকি সোম। ঠিকই আছে। ট্রান্সমিটারের কাছে কোনও শব্দ হলেই, সেটা যদি মানুষের কণ্ঠস্বর হয়, তা হলেও সিগনাল হুইস্‌লটা বেজে উঠবে। সেই আওয়াজ বাড়ির যে-কোনও জায়গা থেকেই শোনা যাবে।

কিন্তু অন্য কোথাও থাকার দরকার হল না। ল্যাবরেটরি থেকে বেরোতে যাবেন, এমন সময় বাঁশি বেজে উঠল। দ্রুত ফিরে এসে সাত্যকি সোম টিভিডিওটার সুইচ অন্ করে দিলেন। পরিষ্কার ভেসে উঠল ছবি। টেবিলের ওপর রাখা যান্ত্রিক চোখজোড়া তার দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে মস্তিষ্কের এক বিশেষ অংশের সঙ্গে, যে-অংশ দিয়ে চোখে দেখার তরঙ্গ মস্তিষ্কে পৌঁছয়। যান্ত্রিক কান আর মুখ তো যোগ করাই আছে। সামনে মূষিকবাহনের কদাকার মুখ।

মূষিকবাহন বলছেন, "তোমার মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রেখেছি। এই মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয় না। এর শক্তি আরও বাড়ালে কমপিউটারের মতন স্মৃতি লাভ করবে, অথচ স্বাধীন চিন্তারও অধিকারী থাকবে। এর জন্যে কি তোমার গর্ব হয় না ? তুমি বৃথা রাগ করছ।"

সাত্যকি সোম বুঝলেন, এর আগেই হয়তো একবার মূষিকবাহনের সঙ্গে মস্তিষ্কের কথা হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, এখান থেকেই রেকর্ড হোক।

মস্তিষ্ক রেগে গিয়ে বলে উঠল, "আজ বুঝতে পারছি, আপনার চেহারার মতন আপনিও একটা শয়তান। আমাকে হত্যা করেছেন আপনি। আপনার গবেষণার জন্যে একজন রোগীর প্রাণ নিয়েছেন, যে তার চিকিৎসার জন্য আপনার উপর নির্ভর করেছিল।"

মৃষিকাবাহন বিরক্ত হয়ে বললেন, "আঃ! কে বলল তোমার প্রাণ নিয়েছি? এই তো তুমি বেঁচে আছ, কথা বলছ। তা ছাড়া তুমি নিজে থেকেই পড়ে গিয়েছিলে…"

কথাটা শেষ হল না। মৃষিকবাহন কাঁপতে কাঁপতে সামনের চেয়ারে বসে পড়লেন।

মস্তিষ্ক গম্ভীরকণ্ঠে বলে চলল, "ডাক্তার মৃষিকবাহন বটব্যাল, আপনি হয়তো জানেন না, আমি সম্মোহন জানতাম। এই চোখ দিয়েও সেটা পারি। আপনি বলুন, আমাকে হত্যা করেছেন কি না। যা ঘটেছিল বলুন।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতন মৃষিকবাহন বলে চললেন, "আমি তোমাকে হত্যা করেছিলাম একটা টাটকা মস্তিষ্ক পাওয়ার জন্যে। অনেকদিন ধরেই এটা পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। সেদিন হাসপাতালের ছাদের ওই অংশটাতে কেউ ছিল না। তোমাকে ডক্টর সোমের কথা জানতে চাওয়ার ছল করে ছাদের নির্জন অংশ দিয়ে হাঁটছিলাম। তারপর কিনারায় আসতেই হঠাৎ পেছন থেকে ধাক্কা দিলাম। বাঁচবার কোনও প্রশ্ন ছিল না। শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আঘাতটা যাতে মস্তিষ্কে না লাগে, তার জন্যে তোমার স্কুটার চালানোর হেলমেটটা মাথায় পরতে বলেছিলাম। তুমি ভেবেছিলে, মাথার যন্ত্রণা লাঘব করার জন্যে আমি বলেছিলাম। মর্গে ডাক্তার সচদেবকে বলে সহজেই মস্তিষ্কটা আয়ত্ত করতে পেরেছিলাম। তোমার শোকার্ত বাবা তোমার চোখের সঙ্গে মস্তিষ্কটাও হাসপাতালকে দান করতে অরাজি হননি, পরমভট্টারক—"

সাত্যকি সোম নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে একটি শব্দ মাত্র বেরোল, "শয়তান!"

পরমভট্টারক! তাকে তিনিই পাঠিয়েছিলেন ডক্টর বটব্যালের কাছে। টিভিডিওর সামনের টেবিলে দুই কনুইয়ে ভর রেখে নিজের কপালটা টিপে ধরলেন তিনি।

মস্তিষ্ক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "আপনার ওপর থেকে সম্মোহন সরিয়ে নিলাম ডক্টর বটব্যাল। আপনি অপরাধ স্বীকার করেছেন। অবশ্য তাতে আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। কেউ আপনার অপরাধের কথা জানতে পারবে না।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরমভট্টারকের মস্তিষ্ক বলল, "আমার হৃদ্‌যন্ত্র নেই। থাকলে নিজের অবস্থা জেনে হয়তো হার্টফেল করতাম। কিন্তু একটা ম্যাজিক দেখিয়ে আমি অনেক ডাক্তারকে অবাক করে দিয়েছি অনেক অনুষ্ঠানে। প্রায় পাঁচ মিনিট হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ করে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছি। তাঁরা কেউ স্টেথিসকোপ আমার বুকে চেপে ধরেছেন। কেউ নাড়ি ধরেছেন। না পেয়েছেন হৃদ্‌স্পন্দন, না পেয়েছেন নাড়ির স্পন্দন। আজ সেই ম্যাজিক দেখানোর চেষ্টা করব। ওই স্ট্যানডে রাখা কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড আমার ব্রেনের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই ওটার ওপর আমার প্রভাব খাটবে। দেখুন, শেষ ম্যাজিক। তারপরে এই মস্তিষ্কটা আপনার ল্যাবরেটরির অন্য বয়ামগুলোতে রাখা মস্তিষ্কের মতোই একটা মৃত মস্তিষ্কে পরিণত হবে।"

ডাক্তার মৃষিকবাহন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন উঠে দাঁড়ালেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন, রক্তসঞ্চালন আর বিশুদ্ধিকরণের যান্ত্রিক হৃদ্‌যন্ত্রের পাম্পমেশিনের ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাচ্ছে। মিনিটে ষাট, বিয়াল্লিশ, কুড়ি…ব্যস্। ইলেকট্রনিক এইচ-বি-ডি-ইউ বা হার্টবিট ডিসপ্লে ইউনিটে চতুর্থ মিনিটে আর কোনও সংখ্যাই এল না। এও কি সম্ভব! যন্ত্র পঁচাত্তর বছরের গ্যারান্টিযুক্ত। তিনি একবার এই বোতাম, একবার ওই বোতাম টিপে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর জন্যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ বয়ামের দিকে চোখ পড়তেই তিনি সেটা দেখলেন। অসহায়ের মতন স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে দেখলেন, কী ভাবে পরমভট্টারকের মস্তিষ্কটা গলে গলে যাচ্ছে। পচনরোধী ওষুধের অভাবে একটা মৃতদেহের মস্তিষ্কের তিন-চারদিনে যে অবস্থা হয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই এই মস্তিষ্কটা সেই অবস্থায় পৌঁছল।

পরদিনই আবার সাত্যকি সোমের আগমন তাঁর কাছে বিরক্তিকর লাগল। ভাবলেন, ডক্টর সোম হয়তো এই মস্তিষ্কটার ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্ট পেয়েছেন। কিন্তু তিনি তো জানেন না, এ-যাত্রায় তাঁর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

সপ্তাহের এই দিনটাতে তিনি রোগী দেখেন না। সকালে শুধু একবার হাসপাতালে যেতে হয়। সাত্যকি সোমকে গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে বললেন, "কিছু হল না, ডক্টর সোম। যান্ত্রিক গোলযোগে মস্তিষ্কটা নষ্ট হয়ে গেল। আপনার যন্ত্রপাতি আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

সাত্যকি সোম ফাঁকা বয়ামটির দিকে তাকালেন, যেমন করে মৃত প্রিয়জনের ফাঁকা ঘরের দিকে লোকে তাকায়। পরমভট্টারকের দ্বিতীয় মৃত্যু তিনি তাঁর টিভিডিওর পর্দায় দেখেছেন।

যন্ত্রগুলো হাতে নিয়ে ডক্টর সোম বললেন, "আমার আরেকটা যন্ত্রও আপনার এখানে আছে, ডক্টর বটব্যাল। সেদিন যখন আমার জন্যে জল আনতে গেলেন, সেই সময় এটা এখানে রেখে দিয়েছিলাম।" এই বলে পাশের কাবার্ডের এককোণে রাখা মিনি ট্রান্‌স্‌ভিশনটা তুলে নিলেন তিনি। পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত শব্দ আর দৃশ্য দুটোই ট্রান্‌স্‌মিট করতে পারে যন্ত্র। আর ডক্টর সোমের বাসস্থান তো এখান থেকে তিন কিলোমিটার মাত্র।

মৃষিকবাহন কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকালেন ডক্টর সোমের দিকে। সাত্যকি সোম বললেন, "আপনার সঙ্গে পরমভট্টারকের কথোপকথনের দৃশ্য-শ্রাব্য সবই ধরা আছে আমার ভিসিআর-এ। একজন প্রতিভাবান নিরপরাধ তরুণকে জঘন্যভাবে হত্যার অপরাধের প্রমাণ হিসাবে ওটা পুলিশের হাতে যাবে।"

কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মৃষিকবাহন। তারপর হো হো করে অট্টহাসি হেসে বললেন, "সম্মোহিত করে আমাকে দিয়ে ও-কথা বলিয়ে নেওয়া হয়েছে, এ-কথা বিশ্বাস করাতে বেগ পেতে হবে না। কাজেই ওটা ধোপে টিকবে না। এর পরে যার মস্তিষ্ক জোগাড় করব, সে আর যাই হোক, এসব হিপ্নোটিজম্-ফিজম্ যেন না জানে, সে দিকে নজর রাখতে হবে।"

সাত্যকি সোম স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মৃষিকবাহনের কথা শুনে। বুঝতে পারলেন, একটা জীবন্ত মস্তিষ্ক না পাওয়া পর্যন্ত মৃষিকবাহন বিরত হবেন না। আর তার বলি হবে তাঁরই কোনও রোগী। মানসিক রোগগ্রস্ত বা মস্তিষ্কের রোগীর পক্ষে

আত্মহত্যা করাটা যে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তা ছাড়া ব্রেন অপারেশনে মৃত্যু তো এখনও হয়। মৃষিকবাহন এইসব বানানো কারণে আড়ালে নিরাপদেই থাকবেন।

তাই এবারে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন ডক্টর সোম।

মৃষিকবাহনের জান্তব মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "ডক্টর বটব্যাল, আপনি হয়তো এস-এল-ডি'র নাম শুনেছেন। না, না, এই মিথ্যানিরূপণ যন্ত্র এখন পৃথিবীর সব জায়গার পুলিশ আর আদালতের অপরিহার্য অঙ্গ। ওতে কোনও ভুল হয় না। শতকরা নিরানব্বুই ভাগ নির্ভুল। বাকি একভাগ, কোন্ ক্ষেত্রে হয়, সেটাও হয়তো আপনি জানেন। হ্যাঁ, মস্তিষ্ক-বিকৃত লোকেদের বেলায়। আপনি তার মধ্যে পড়েন কি ? আমার এখন সন্দেহ হয়। নইলে এস-এল-ডি যন্ত্রের সামনে আপনার বিবৃতি ধোপে টিকবে ডক্টর বটব্যাল।"

মুহূর্তের জন্যে রক্তহীন হয়ে গেল মৃষিকবাহনের মুখ। নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। তারপর অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন, "গবেষণার খাতিরে ভবিষ্যৎ-মানুষের কল্যাণের স্বার্থে যদি মাত্র একজনের জীবন গিয়েই থাকে, সেটাকে এত বড় করে দেখছেন কেন, ডক্টর সোম ? বিশেষ করে, আপনার মতন একজন বিজ্ঞানী ?"

ডক্টর সোম গম্ভীরভাবে বললেন, "এ-প্রশ্ন বিচারকের সামনেই না হয় তুলবেন।"

আবার কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে থাকলেন ডক্টর মৃষিকবাহন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। বিজ্ঞানের জন্যে আমি প্রাণ দিতে ভয় পাই না। আমি বিচারকের সামনে বলব আমার গবেষণার কথা। ভবিষ্যৎ-মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের জন্যে আমি একটা ব্যাঙ্ক করতে চেয়েছিলাম। যাতে থাকবে মেধাবী মস্তিষ্ক। যাদের আয়ু হবে কয়েকশো বছর। তাতে তাদের মেমারি স্টোরেজ বিশাল হবে। সারা দিনরাত তারা জ্ঞান আহরণ করবে পড়াশোনা করে যান্ত্রিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। সাধারণ মানুষের মতন এই মস্তিষ্ক বৃদ্ধ হবে না।"

বক্তৃতা বন্ধ করে ডক্টর বটব্যাল যা করলেন তাতে সাত্যকি সোম অবাক হয়ে গেলেন। যেন এতক্ষণ কিছুই হয়নি, এমনভাবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বরে বললেন, "যাকগে, আপনি আপনার কর্তব্য করবেন নিশ্চয়। আজ আবার চেম্বার বন্ধ বলে কৌটিল্যকে ছুটি দিয়েছি। একটু বসুন, আমি চটপট দু'কাপ কফি করে আনি।"

সাত্যকি সোম আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মৃষিকবাহন ভেতরে ঢুকে গেলেন। সত্যিই দু'মিনিটের মধ্যে দু'কাপ কফি নিয়ে এসে হাজির হলেন তিনি। চেম্বারের পাশেই একটা ছোট্ট কেবিনে গ্যাসস্টোভের সামনে চা কফির সরঞ্জাম সব আছে।

বাইরে থেকে একটা গন্ধ আসছে কি ? সাত্যকি সোম নাক কুঁচকে অনুভব করার চেষ্টা করলেন। মৃষিকবাহনকে বললেন, "আপনার গ্যাসস্টোভটা বন্ধ করেছেন তো ডক্টর বটব্যাল ? একটা গন্ধ আসছে যেন।"

ডক্টর বটব্যাল ছুটে ভেতরে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, "হ্যাঁ, বন্ধই আছে। বাইরে থেকে হয়তো আসছে। আমি তো পাচ্ছি না।"

কফি পান শেষ করে সাত্যকি সোম উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। তাঁর জন্যেই পরম ভট্টারক আজ নেই। আবার যতই পাষণ্ড হোক, মৃষিকবাহনের মতন দেশবিখ্যাত একজন ডাক্তার—

মৃষিকবাহনের সঙ্গে করমর্দন করে ক্লান্ত স্বরে সাত্যকি সোম বললেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন ডক্টর বটব্যাল। কিন্তু, আমার বিবেক..."

ডক্টর সোমকে কথা শেষ করতে দিলেন না মৃষিকবাহন। বিকটভাবে হেসে উঠে বললেন, "আপনাকে আর বিবেকের দংশন বেশিক্ষণ ভোগ করতে হবে না ডক্টর সোম। আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আপনার মৃত্যু হবে। আপনার কফির পেয়ালায় যা মিশিয়েছি সেটা পোস্টমর্টেমেও ধরা পড়ে না। কার্ডিয়াক ফেলিওর এটাই সকলে বুঝবে। না, বমি করেও কিছু হবে না। ওটা রক্তের সঙ্গে মিশতে কয়েক সেকেণ্ড লাগে, অথচ শারীরিক কোনও অস্বস্তিবোধ হয় না।" একটু থেমে হেসে মৃষিকবাহন বললেন, "হ্যাঁ, এস-এল-ডি'র সামনে গেলে হয়তো অপরাধী ধরা পড়ত, কিন্তু এখানে সে প্রশ্নই উঠবে না কারও মনে। কোনও স্বার্থের সংঘাত বা বিদ্বেষ যে আমাদের মধ্যে থাকার কারণ নেই, সে বিষয়ে ওসব কাগজের কাদাখোঁচা পাখিরাও নিঃসন্দেহ।"

এ-কথা শুনে সাত্যকি সোম কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে মৃষিকবাহনের দিকে চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, "কিন্তু এখানেও যে একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল ডক্টর বটব্যাল। আমার কাপে বেশি কফি দিয়েছেন দেখে আমি কাপ-দুটো পাল্টাপাল্টি করে নিয়েছিলাম, যখন আপনি গ্যাসস্টোভটা দেখতে গেলেন তখন। এ-সময় কফি খাওয়ার অভ্যাস তো আমার নেই।"

এই বলে নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়লেন তিনি। ঘর থেকে বেরিয়ে একবার পেছন ফিরে দরজাটা ভেজাতে গিয়ে দেখলেন, ডাক্তার মৃষিকবাহন চেয়ারে বসে হাতলদুটো প্রাণপণ চেপে ধরেছেন। তেলা মুখমণ্ডলে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। রাস্তায় নেমে ভারাক্রান্ত মনে সাত্যকি সোম ভাবলেন, হয়তো এটাই ভাল হল। অত বড় একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানীর পক্ষে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় শোনা—বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি নিজেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারতেন না।

ছবি : প্রবীর সেন

দেখি, ছিপিটা খুললে ক্যাপ্টেনের ঘুম ভাঙে কি না···
এই হচ্ছে ওর ওষুধ !
খুলেছে !
পপ্ পপ্ = = জাগো !
যথেষ্ট হয়েছে!
হ্যাঁ, কী বলছিলে ? কারা খুঁজতে বেরিয়েছে ? তাদের আমি বেদম ঠ্যাঙাব !
শ্‌শ্, চলো, বেরিয়ে পড়ি !
ভোর না হতেই···
ওয়াদেসদায় পৌঁছেছি । সদরফটক দিয়ে ঢুকতে গেলে ধরা পড়ব । একটা খিড়কির পথ আমার জানা আছে ।
যাক্, নিরাপদে ঢুকে পড়া গেছে । এখন সেনর অলিভেরার বাড়িতে যাওয়া দরকার ।
ওই যে, ওই বাড়িটা ।
আপ্যায়ন কেমন হবে, কে জানে ।
সেনর অলিভেরা !···
সেনর অলিভেরা !···
বাড়ি পালটায়নি তো ?
সেনর অলিভেরা ! দরজা খুলুন !
?
উরেবাবা ! সেপাই !
লুকিয়ে পড়ো !
কে ওখানে ?

লোহিত সাগরের হাঙর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

ভাঙা দল খেলতে নেমেছে, এবারে মন ভাঙবার পালা

জোড়াতালি দিয়ে লিগ মরসুম শুরু করেছে রোভার্স। কারফোর্ডের বিরুদ্ধে কর্নার থেকে গোল হল না। হল ভুল বোঝাবুঝি। দু'জনে একসঙ্গে হেড নিতে যাওয়ায় গাথরি আর ডিক্সনের সংঘর্ষ ঘটেছে।

ওহে ইডিয়ট, হেড নেবার জন্য রয় আমাকে ডাকল, তা দেখতে পাওনি ?

খবর্দার ইডিয়ট বলবে না !

কী ছেলেমানুষি হচ্ছে ! থামো !

তোমরা এদিকে ঝগড়া করছ, আর কারফোর্ড ওদিকে বল নিয়ে এগিয়ে গেছে !

গাথরি নেই, নেলর কি আটকাতে পারবে ?

গোল একদম ফাঁকা !

উঃ !

নেলর আটকাতে পারল না !

কারফোর্ড গোল দিয়েছে !

চার্লি আর কী করবে

ঝগড়া ভুলে গিয়ে লড়ে যাও সবাই !

আমার দোষ নেই, রয় !

ঝগড়ার জের কিন্তু চলল ...

বলটা আমাকে দিলে না কেন গাথরি ?

এগোলে না কেন ?

রয় ছুটে এসে ঠেকাল ...

ডিক্সন আশা করি ঠিক জায়গায় আছে !

শাবাশ রয় ! যেমন ট্যাকল, তেমনি ব্যালান্স !

ডিক্সন ছিল !
বল নিয়ে এগোও,
গোলে ঢোকাও ! ডিক্সন !
কিন্তু ...
ধুত, পারল না !
কাটালেই গোল পেত !
দুঃখিত রয়, মন চঞ্চল ছিল !
খুবই স্বাভাবিক !
ঝগড়া করবার এই হচ্ছে পরিণতি
গাথরিও স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারছে না ...
উঃ !
অতি বাজে ট্যাকল !
কারফোর্ডের ফ্রি কিক !
আমি তো বলই মেরেছিলাম !
তর্ক কোরো না !
ও ইচ্ছে করে আছাড় খেয়েছে !
গাথরির মেজাজ অল্পেই বিগড়ে যায় ...
ফলে হলুদ কার্ড দেখতে হল !
বড্ড বিচ্ছিরি মেজাজ !
কারফোর্ড ফ্রি কিক নিল ...
বল গোলে ঢুকেছে !
ছি ছি রোভার্স ! খেলা ছেড়ে ঘাস কাটো !
দর্শকদের দোষ দেব কী করে ? সত্যি তো, আমরা যাচ্ছেতাই খেলছি !
রয় খেলোয়াড় পালটাতে চায় ...
ট্রেভরকে নামতে বলছে ।
কার জায়গায় নামাবে ?
কার জায়গায় নামানো হবে, বলতে পারো ?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

সবচেয়ে ভাল লাগত কালীর মাথার মুকুটটা ···

মুকুট

মানবেন্দ্র পাল

তখন আমার বয়েস বছর-বারো। দেশের বাড়িতে থাকি। রাত্তিরে একা শুই। পড়ার ঘরেই আমার শোবার ব্যবস্থা। একা শুই—তা ঘুম না আসা পর্যন্ত ভয় করে। তখনকার দিনে নানা রকমের ভয় ছিল। সে-সব ভয়ের কথা বলে দরকার নেই।

ক'দিন ধরেই মাঝরাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। স্পষ্ট শুনতে পাই তিনতলায় যাবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। কে যেন খুব সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছে। প্রতিবারই ভাবি সকালে মা-বাবাকে বলব। কিন্তু ভুলে যাই। কিংবা ভাবি, হয়তো ঘুমের ঘোরে ভুল শুনেছি।

কিন্তু একদিন আর কিছুতেই ভুল বলে মনে হল না। সেদিন রাত্তিরে শুধু পায়ের শব্দই শুনলাম না। আরও কিছু কানে গেল। বুঝলাম নির্ঘাত চোর এসেছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। কোনওরকমে ডাকলাম, "মা।"

মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। বললেন, "কী রে! কী হয়েছে?"

বললাম, "সিঁড়িতে যেন শব্দ শুনলাম।"

মা উড়িয়ে দিলেন। বললেন, "ইঁদুর-টিদুর হবে। ঘুমো।"

অগত্যা আবার শুয়ে পড়তে হল।

সকালে উঠে আমি আবার সবাইকে সেই শব্দের কথা মনে করিয়ে দিলাম। কিন্তু কেউ তেমন করে শুনল না। আমি তখন নিজেই এঘর-ওঘর, আলমারি, সিন্দুক পরীক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু চুরির কোনও লক্ষণই দেখতে পেলাম না। আমি হতাশ হয়ে গেলাম। অথচ আমি জানি, নিশ্চয় চোর এসেছিল।

মাসকয়েক হল আমাদের বাড়ি একটি কাজের মেয়ে এসেছে। কিছু দূরে বাউড়িপাড়ায় বাড়ি। মেয়েটির বাপ অকালে মারা গেছে। মারামারি করে বুকে চোট খেয়েছিল। তারপর আর বেশিদিন বাঁচেনি। মেয়েটি খুবই গরিব। তাই আমাদের বাড়ি খাওয়া-পরা দিয়ে রাখা হয়েছে। নাম নয়নতারা। আমারই বয়সী। আমার ভাইবোন ছিল না। তাই ওই ছিল আমার খেলার সঙ্গিনী।

কেউ যখন আমার কথা মন দিয়ে শুনল না তখন ওকেই আমি সব ঘটনা বললাম। শুনে ওর দু'চোখ গোল হয়ে গেল। বললে, "হেই মা! সে কী কথা গো! তা পুলিশে খবর দাও।"

আমি হতাশ হয়ে বললাম, "কেউ তো আমার কথা শুনছে না। তা ছাড়া—তা ছাড়া—কী যে চুরি গেছে তাই তো বোঝা যাচ্ছে না।"

নয়নতারা বলল, "যাইহোক বাবু, সাবধানে থেকো।"

সাবধানে কী আর থাকব—যেমন চলছিল তেমনিই সব চলতে লাগল। সুখের কথা, সেই পায়ের শব্দ আর শুনতে পাইনি।

দিন-সাতেক পরের ঘটনা।

সেদিন দুপুরে আমি চিলেকোঠার দরজা খুলে ঢুকলাম। ইচ্ছে লাইটটা নিয়ে ঘুড়ি ওড়াব। ঘরে ঢুকতেই আমার নজরে পড়ল সামনের দেওয়ালটা যেন কেমন ফাঁকা। কী যেন ছিল, এখন নেই। তখনই মনে পড়ল—আরে এখানে তো মুকুটটা ছিল! সেটা গেল কোথায়?

না, সোনার মুকুট নয়। তারের ওপর রঙিন ঝকঝকে রাঙতা-মোড়া মুকুট। তাও নতুন নয়। তার বেঁকে গেছে। রাঙতাও ছিঁড়ে গেছে অনেক জায়গায়। তবু সেটা এই

দেওয়ালেই পেরেকের সঙ্গে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল। সেটাই উধাও।

মুকুটটার পিছনে সামান্য একটা ঘটনা আছে।

আমাদের এখানে কালী ময়রার কালী ছিল। বিখ্যাত। প্রতি বছর কালীপুজোয় খুব ধুমধাম হত। আমাদের খাবার নেমন্তন্ন হত। বাবার সঙ্গে যেতাম। আমি অবাক হয়ে সেই বিরাট কালী দেখতাম। সবচেয়ে ভাল লাগত কালীর মাথার মুকুটটা। এই মুকুটের ওপর লোভ ছিল অনেক বাড়ির ছেলেরই। নদীতে বিসর্জন হবার সঙ্গে সঙ্গেই দুরন্ত ছেলেরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ত মুকুটটা ছিনিয়ে আনার জন্যে। তাই নিয়ে কম মারামারি হয়নি।

আমি যেদিন জানলাম আমাদের ঝি পেয়ারির ছেলে নির্মল কালী ময়রার ঠাকুরের বাঁধা বেহারা, সেদিনই পেয়ারিকে বললাম, "এবার কালীর মুকুটটা এনে দিতেই হবে।"

পেয়ারি প্রথমে একটু থমকে গেল। কী ভাবল। তারপর বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে। নিমেকে বলব।"

তা পেয়ারি কথা রেখেছিল। বিসর্জনের পরের দিন পেয়ারি নিজের হাতে খুব যত্ন করে এনে আমায় দিল। আমার সে কী আনন্দ! মা কালীর মাথার অত বড় মুকুটটা আজ আমার! মা খুশি হয়ে পেয়ারিকে চার আনা বকশিশ দিলেন। পেয়ারির মুখে তবু হাসি নেই। মাকে শুধু বলল, বড় হুজ্জত হয়েছে গো দিদিমণি!" কিন্তু সেটা কী তা আর বলল না।

আমি দিনকতক যাকে পাই তাকেই ডেকে মুকুটটা দেখাই। তারপর ক্রমে আকর্ষণ কমে গেল। ওটাকে তুলে রাখা হল চিলেকোঠার দেওয়ালে।

মুকুটটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তারপর নয়নতারা যখন এল, ওর সঙ্গে যখন আমার বেশ ভাব জমে উঠল, তখন একদিন ওকে চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে গিয়ে আমার সেই গোপন ঐশ্বর্য দেখালাম।

ও অনেকক্ষণ হাঁ করে মুকুটটা দেখল। তারপর অবাক হয়ে বলল, "এ যে কালী ময়রার কালীর মুকুট গো! এ তুমি কোথায় পেলে?"

আমি তখন সগর্বে তাকে সব ঘটনা বললাম।

শুনতে শুনতে ওর মুখচোখ কেমন যেন হয়ে গেল। বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "এই মুকুটটা তা হলে তোমার ঘরেই এসেছে! কিন্তু ওটা তো আমার। আমি ওটা নেবই।"

বলে কী মেয়েটা! আজ দু'বছর হল মুকুটটা আমার সম্পত্তি হয়ে আছে আর ও বলে কিনা ওটা ওর! আমি ওকে ঠেলে বের করে দিয়ে ঘরের শেকল তুলে দিয়েছিলাম।

কিছুদিন ওর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ ছিল, তারপর অবশ্য ভাব হতে দেরি হয়নি, কিন্তু মুকুটের কথা আর ওঠেনি।

আজ শূন্য দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন যেন নয়নতারাকেই সন্দেহ হল। নিশ্চয় ওই চুরি করেছে। আমি তখনই কথাটা মাকে বললাম। কিন্তু পুরনো একটা তারের মুকুট চুরি নিয়ে মা মাথা ঘামালেন না। আমি বাবাকেও বললাম। বাবা বললেন, "গোল কোরো না এখন।" আমি তখন নয়নতারার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। ও প্রথমে থতমত খেয়ে গেল। তারপর কাঁদতে শুরু করল।

আমি আবার মাকে এসে বললাম। মা এবার নয়নতারাকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু ওকে পাওয়া গেল না।

মেয়েটা গেল কোথায়? খোঁজ খোঁজ—

ত্বকের সংক্রমণ যেমনি অস্বস্তিকর ও
বিরক্তিকর তেমনি বিচ্ছিরি

**প্র্যাগমেটর কাজ করে চারভাবে,
তাই সংক্রমণ দূর করে ও
চটপট সারিয়ে তোলে।**

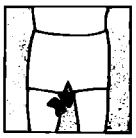

ধোবিজ ইচ্— সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে হয়। 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করে সারিয়ে তুলুন।

হাজা—ভেজা পায়ে হতে চায়। দ্রুত আরাম পেতে 'প্র্যাগমেটর' লাগান।

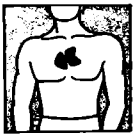

দাদ—শরীরের যে-কোনো জায়গাতেই হতে পারে। অবহেলা করবেন না—উপশমের জন্যে 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করুন।

স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চললে অথবা সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে এধরণের ছত্রাকজনিত ত্বকের সংক্রমণ হতে পারে— যে-কোনো সময়েই। প্র্যাগমেটর চারভাবে কাজ করে বলে এসব বালাই দূর হয়ে যায়। ডাক্তাররাও তাই প্র্যাগমেটরই ব্যবহার করতে বলেন।

তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢোকে
'প্র্যাগমেটর' তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢুকে সংক্রামিত জায়গায় ও তার চার পাশে কাজ শুরু করে দেয়।

চটপট চুলকানি বন্ধ করে
'প্র্যাগমেটরে' সংক্রামিত জায়গা আঁচড়ানোর ইচ্ছেকে প্রশমিত করে তাই সংক্রমণও ছড়াতে পারে না।

ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে
'প্র্যাগমেটর' সংক্রামিত ত্বক সারিয়ে দেয় এবং ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে দিয়ে ত্বকের স্বাস্থ্য ফেরায়।

ছত্রাকজনিক সংক্রামণ রোধে
'প্র্যাগমেটরে' আছে সুপরিচিত ও কার্যকর ছত্রাক-প্রতিরোধী জিনিষ গন্ধক যা গুঁড়ো আকারে থাকায় সংক্রামিত জায়গায় আরো ভালভাবে লাগে।

আয়োডেক্স নির্মাতাদের তৈরি

1148 BEN

PRAGMATAR®

Ointment of Cetyl Alcohol, Cetyl Tar Distillate, Sulphur and Salicylic Acid

'প্র্যাগমেটর' মানেই হাতের কাছে দ্রুত আরাম

SKF —AN ESKAYEF PRODUCT © Eskayef Limited

এবার সবার টনক নড়ে উঠল। মুকুট চুরি করাটা তেমন কিছু নয়, কিন্তু চুরি তো। এর পর তো আরও বড় কিছু চুরি করতে পারে। তা ছাড়া চুরি ওই করেছে। নইলে পালাবে কেন?

বাবা অমনি মুহুরিকে পাঠালেন নয়নতারাকে ওর বাড়ি থেকে ধরে আনতে। সঙ্গে আমিও গেলাম।

মাইলখানেক দূরে নদীর ধারে বাউরিপাড়া। শুয়োরের পাল চরছে সামনের মাঠে। উঠোনে মুরগি। চারদিকে নোংরা। তারই মধ্যে নয়নতারাদের মাটির ঘর। আমাদের দেখে মাথার কাপড় টেনে নয়নতারার বিধবা মা বেরিয়ে এল। খাতির করে দুটো জলচৌকি এগিয়ে দিল বসতে। আমরা বসলাম না।

মুহুরিকাকা জিজ্ঞেস করল, "নয়ন এসেছে?"

মা বলল, "হ্যাঁ, এসেছিল। আবার কোথায় গেল।"

"একটা তারের মুকুট এনেছিল?"

নয়নতারার মা মাথা দোলাল। বলল, "হ্যাঁ, কদিন আগে কাদের বাড়ি থেকে একটা 'মুটুক' এনেছিল বটে। তা সেটা তো নেই। ও তো বলল ওটা ওর। ওর বাপই ওকে দেবার জন্যে জল থেকে তুলেছিল।"

আমি ধমকে উঠে বললাম, "ওর কোথায়! আমাকে দিয়েছিল তো পেয়ারির ছেলে নির্মল।"

"নিমে!" এবার নয়নের মায়ের দু চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ল।

"হ্যাঁ, নিমে। তোমার মেয়ে আমাদের বাড়ি থেকে ওটা চুরি করে এনেছে।"

নয়নের মা এ-কথার উত্তর দিল না। হঠাৎ কী হল, দাঁতে কাপড় চেপে ডুকরে কেঁদে উঠল।

আমি তো অবাক। মুহুরিকাকা আমার হাত ধরে নিচু গলায় বলল, "বাড়ি চলো।"

রাস্তায় যেতে যেতে মুহুরিকাকা বলল, "নয়নতারার বাপ শিবপদও কালীময়রার কালীর বেহারা ছিল। নয়নতারা নাকি বাপকে বলেছিল, মা কালীর মুকুটটা তার চাই। শিবপদ আনব বলেছিল। বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শিবপদ সাঁতরে মুকুটটা ধরেছিল। এমন সময়ে আমাদের পেয়ারির ছেলে নিমে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিবুর ওপর। জলের মধ্যেই মারামারি। ঠাকুরের বাঁশটা লেগে যায় শিবপদর বুকে। সেই যে বুকের অসুখে পড়ল আর উঠল না।"

ঘটনাটা জানতাম না। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

বললাম, "মুকুটটা তা হলে নয়নতারারই।"

মুহুরিকাকা বললেন, "হ্যাঁ, তাই। শিবুই তো প্রথম মুকুটটা পায়। নিমে কেড়ে নিয়ে এনে দেয় তোমায়।"

"কিন্তু মুকুটটা তো ওর বাড়িতে দেখলাম না।"

মুহুরিকাকা বললেন, "টের পেয়েছিল আমরা আসব। সরিয়ে ফেলেছে।"

চুপ করে গেলাম। নিঃশব্দেই দুজনে হেঁটে চলেছি নদীর ধার দিয়ে। মনটা কেমন ভারী হয়ে গেছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। "কাকা, জলে ওটা কী ভাসছে?"

মুহুরিকাকাও দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সেই মুকুটটা। কোন্ ফাঁকে নয়নতারা চুপি-চুপি নদীতেই বিসর্জন দিয়ে গেছে।

ছবি : দেবাশিস দেব

নেংটিস ইন্ডারিকা

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

আমাদের আধা-শহরের শেষ সীমানায় ছিল ক্যাথলিক মিশনের বিরাট চৌহদ্দি। মেহেদির বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার ভেতরে গির্জা। উঁচু গম্বুজ। রঙিন কাঁচ লাগানো দরজা-জানালা। দরজা-জানালার ওপরের অর্ধচন্দ্রাকার খিলানের উপরেও কারুকাজ-করা রঙিন কাঁচ। গির্জার ঠিক সামনেই একজোড়া দেবদারু গাছ। একই সাইজের। যমজ ভাইয়ের মতো। পিছনে ছোট একটা পুকুর। শালুকে একদম ভর্তি। তার একপাশে কয়েকটি লাল রঙের টালি-ছাওয়া ঘর। অন্য পাশে পাদরি বেনেডিক্ট-সায়েবের বাংলো। সামনে লন। কেয়ারি-করা ফুলের বাগান। সব মিলিয়ে বেশ ছিমছাম, পরিপাটি, ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো। বেনেডিক্টসায়েব বেশ মিশুক ছিলেন। বিয়ে, অন্নপ্রাশন বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন করলেই আসতেন। ফোটো তুলতেন। পাত পেড়ে খেতেন।

আমাদের আধা-শহরে সব সম্প্রদায়ের লোকের বাস ছিল, যেহেতু এটা ছিল লাক্ষা শিল্পের একটা বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র। বাঙালি, বেহারি, মারোয়াড়ি, মির্জাপুরী, পাঞ্জাবি প্রভৃতি সকল অঞ্চলের লোকই বেশ মিলেমিশে থাকতেন। পারস্পরিক সম্প্রীতিও ছিল বেশ। কিন্তু সায়েবদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার একটা আলাদা সম্ভ্রম ছিল। যেহেতু আমাদের শহরে মাত্র একটি সায়েব-পরিবারেরই বাস, অতএব আমরা খুবই সঙ্কুচিত থাকতাম।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করত, তোমাদের শহরে ক'জন সায়েব বসবাস করেন, তা হলে আমরা জবাব দিতাম, বেনেডিক্ট-সায়েব, ওঁর বড় ছেলে বিল, ছোট ছেলে পিটার, মেয়ে মেরি আর মেমসায়েব মার্গারিটা।

এমনি একটা কথার সূত্রে মেজদা মশকরা করে বলল, "আর বাকিদের নামগুলো বলতে ভুলে গেলি ? বাবুর্চি টম, আয়া জুলি আর পোষা কুকুর জ্যাক।"

বুঝতে পারলাম, মেজদা তামাশা করছে। আমি রেগে গিয়ে বললাম, "কেন, যা বললাম তা কি মিথ্যে ?"

বিল্টুও হিন্দিতে আমাকে জোরদার সাপোর্ট করে বলল, "ক্যা ইয়ে সব গলদ হ্যায় ?" উত্তেজনার মুখে বিল্টু বাংলাটা ঠিক বাগে আনতে পারে না। তখন ওর মুখ দিয়ে শুধু হিন্দিই বেরোয়।

মেজদা নির্বিকার গলায় বলল, "গলদ তো নেই হ্যায়, কিন্তু আমিও তো সেনসাস কা সুপারভাইজার নেই হ্যায় যে, এক পরিবারের সব লোকজনের নাম বলে যাচ্ছিস।"

আমি বললাম, "তাতে কী, সায়েব রইল না রইল বয়েই গেল। সায়েব তো সোনাদানার মতো দামি সম্পত্তি নয়।"

মেজদা বলল, "তার চেয়েও বেশি। ওরা হল রাজার জাত। লালমুখোগুলোর দাপট দেখিসনি। ধরাকে সরা জ্ঞান করে। ব্যাটারা আমাদের দুশো বছর ধরে পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছে।"

এ-কথাটা আমরা তখন প্রায়ই শুনতাম। দেশে তখন স্বদেশী আন্দোলনের আগুন জ্বলছে। স্বাধীনতার জন্য মরণপণ লড়াই চলছে তখন। চারিদিকে পুলিশের ধরপাকড়। মোটের ওপর আমরাও বুঝেছিলাম, সায়েবরা আমাদের জাতীয় শত্রু। অবশ্য সায়েবদের মধ্যেও তো ভালমন্দ আছে। বেনেডিক্ট-সায়েব ছিলেন নিপাট ভালমানুষ। আবার আমাদের জেলার পুলিশ-সায়েব, যাঁর নাম ছিল জন বুল, তিনি নাকি

নামমাহাত্ম্য বজায় রাখার জন্য ষাঁড়ের মতোই দাপিয়ে বেড়াতেন।

মেজদা ছিল ঘোরতর সায়েব-বিদ্বেষী। মেজদা বলল, "সায়েবদের আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। অবিশ্যি ভাল সায়েব কি নেই ? আছে। যেমন তোদের বেনেডিক্ট-সায়েব। কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। আসলে এরা এসেছে আমাদের দেশটাকে লুটেপুটে খেতে। এইজন্যই আমরা কলকাতায় সায়েব দেখলেই তাদের নাকাল করে ছাড়ি।"

বিল্টু মাথা নেড়ে বলল, "সহি বাত।"

মেজদা উল্লাসের সঙ্গে বলল, "এই তো কথার মতো কথা। এভাবে ন্যায্য কথার তারিফ করবি তো।" তারপর আদর করে বিল্টুর মাথায় আলতো একটা গাঁট্টা মারতেই বিল্টু বলল, "এটা কি প্রাইজ ?"

মেজদা হকচকিয়ে বলল, "প্রাইজ ? কিসের ?"

বিল্টু বলল, "ন্যায্য কথায় সায় দেবার।"

মেজদা বলল, "না। পশ্চিমের রোদে-জলে তোর মাথাটা নিরেট হয়ে গেছে কি না, টেস্ট করছিলাম। তা লেগেছে যখন, তখন মাথার মধ্যে মগজ আছে। এটা জেনে তুই খুশি হতে পারিস।"

মেজদার এইসব যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তায় বিন্দুমাত্রও খুশি না হয়ে বিল্টু মুখ গোঁজ করে বসে রইল।

মেজদা বলল, "শোন তা হলে, একটা গল্প বলি।"

তারপর পাছে আমরা ওর গল্পটাকে গুল-তাপ্পি বলে ভাবি, এজন্য ওর স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় কথাটা শুধরে নিয়ে বলল, "গল্প নয়। ফ্যাক্ট, মানে সত্যি ঘটনা, কীভাবে আমি আর ভোম্বলমামা একজন লালমুখো গোরাকে জব্দ করেছিলাম। অবিশ্যি আমি কিছু করিনি। যা করবার, ভোম্বলমামাই করেছিলেন। আমি শুধু রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চিনেবাদাম খাচ্ছিলাম।"

হঠাৎ যেন ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে বিল্টু বলল, "ভোম্বলমামা, মানে গ্রেট লাঙ্গুয়েজ ট্রেনার ?"

আমি বললাম, "অ্যান্ড সাউন্ড কিলার অলসো। মানে শব্দভেদী।"

মেজদা আমাদের কথায় আমল না দিয়ে বলল, "সেবার ক'দিনের ছুটিতে পশ্চিম থেকে কলকাতায় এসেছেন ভোম্বলমামা। এসেই আমায় বললেন, 'মেজো, চল্, আজ একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।' বেড়াতে বেড়াতে আউটরাম ঘাটে যখন পৌঁছেছি, তখন ভোম্বলমামা বললেন, 'ফুরফুরে হাওয়ায় গঙ্গার ধারে বসে চিনেবাদাম খেতে তোফা লাগে, তাই না রে মেজো ?'

"আমি বললাম, 'গ্র্যান্ড।' ভোম্বলমামা বললেন, 'যা, তা হলে দু'ঠোঙা কিনে নিয়ে আয়।' আমি তো চিনেবাদাম আনতে গেলাম। ঘটনাটা ঘটল ঠিক সেই সময়। একটা ছ'ফুট লম্বা দশাসই চেহারার গোরা তখন আউটরাম ঘাটের কাছে পায়চারি করছিল। ধারেপাশে লোকজন বিশেষ ছিল না। লোকটা ভোম্বলমামার সামনে এসে ওঁর মাথায় আলতো দুটো টোকা মেরে বলল, 'ফারপো হোটেল কিধার হ্যায় ?'

"সায়েবের আস্পর্দায় ভোম্বলমামা তো রেগে কাঁই। ভোম্বলমামার হাইট তো তোদের বলেছি। চার ফুটের এক ইঞ্চিও বেশি নয়। সায়েবের মাথা ভোম্বলমামার নাগালের বাইরে। তা কী আর করা। ওয়াকিং স্টিকটার বাঁকানো হাতলটা দিয়ে সায়েবের কানে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে ভোম্বলমামা বললেন, 'উধার হ্যায়, উধার।'

"সায়েব আশা করেনি একজন সিড়িঙ্গে চেহারার নেটিভ ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারে। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ও ভোম্বলমামাকে ধরতে গেল। মামা তখন ওর দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে ওর পিছনে পজিশন নিয়েছেন। ও পিছু ফিরে তাকাবার আগেই ওয়াকিং স্টিকের হাতল দিয়ে আর-একটা হ্যাঁচকা টান। সায়েব উঁহু উঁহু করে যেই পিছন ফিরে তেড়ে গিয়েছে, অমনি ভোম্বলমামা ওর নাগালের বাইরে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সায়েবকে এক বোম্বাই ভেংচি কাটলেন। সায়েব খাপ্পা হয়ে সেদিকে ছুটে যেতেই ভোম্বলমামা সাঁই করে আরেকটা থামের পিছনে গিয়ে পজিশন নিলেন। সায়েব ওই আড়াইমনি লাশ নিয়ে ছুটে যায় মামাকে ধরতে আর মামাও থাম বদল করে লুকোচুরি খেলতে থাকেন, আর বাচ্চাদের কুমির-কুমির খেলার মতো সায়েবকে দুয়ো দেন। 'আমাকে ধরতে পারে-এ-নি।'

"ভোম্বলমামার ধারণা ছিল, ওই দশাসই চেহারার জোয়ান খানিক পরেই কাহিল হয়ে পড়বে। তখন সুযোগ বুঝে মামাও পগার পার। কিন্তু সায়েব মামার পিছু ছাড়ে না। এক থাম থেকে আরেক থামে চরকির মতো ঘুরতে থাকে। আমি তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঠোঙা থেকে চিনেবাদাম খেতে খেতে এই অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করছি।

"কিন্তু এ রকম লুকোচুরি খেলা তো অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারে না। কোথাও তো থামতে হবে। এদিকে দু'জনের মধ্যেই তখন ষাঁড় আর মাটাডোরের গোঁ। একটু ভেবে মামা স্ট্রাটেজিটা বদলালেন। এবার এক থাম থেকে আরেক থামে লুকোচুরি না খেলে, একটা থাম বেয়ে কাঠবিড়ালির মতো তরতর করে উঠে গেলেন কার্নিসে। সেখান থেকে সায়েবকে নানা কায়দায় ভেংচি কাটতে লাগলেন আর দুয়ো দিতে লাগলেন। সায়েব বাংলাই না-হয় বোঝে না, কিন্তু ভেংচিটা তো ঠিক বোঝে। ভেংচির তো কোনও ভাষা নেই। সায়েবের ভেংচি কাটার আর্টটা জানা নেই। ও জড়ানো ভাষায় গজরাতে থাকে। সে সব ভোম্বলমামার বোঝার বাইরে। কাজেই ওঁর গায়ে লাগছিল না। কিন্তু ভোম্বলমামার নানা ডিজাইনের ভেংচি সায়েবের গায়ে কাঁটার মতো বিঁধছিল।

"মামা ভেবেছিলেন সায়েব এবার তিতিবিরক্ত হয়ে চলে যাবে। কিন্তু সায়েব নাছোড়বান্দা কাবলিওলার মতো নীচে দাঁড়িয়ে মামার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল। এ তো ভাল বিপদ। আমি তখন মামার কাছ থেকে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করছি। মামা কিন্তু নির্বিকার। অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত আমার ফ্রন্টে নামার প্রয়োজন হয়নি।

"ইতিমধ্যে সায়েব একটু অন্যমনস্ক হতেই মামা কার্নিস থেকে সোজা সায়েবের ঘাড়ে। তারপর এক লহমায় কী যেন হয়ে গেল। সায়েব তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে, আর ভোম্বলমামা ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোমর বাঁকিয়ে শিস দিচ্ছেন। আমি তখন শেষ বাদামটির খোসা ছাড়িয়েছি। তোরা তো জানিস, এক ঠোঙা বাদাম কিনলে তার শেষ বাদামটা অবধারিত পচা বেরোয়। এজন্য আমি শেষের জন্য

আগেভাগেই একটা ভাল বাদাম রেখে দিই। সেইটারই খোসা ছাড়িয়ে মুখে দিতে যাব, হেনকালে ওই অঘটনটা ঘটল। সায়েব নানা রকমের অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে আর মামা সেটা তেঁতুলের আচারের মতো তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদ করছেন।"

আমি বললাম, "ভোম্বলমামা সায়েবের ঘাড়ে বিছুটি ঘষে দিয়েছেন বোধ করি ?"

মেজদা বিরক্ত হয়ে বলল, "আউটরাম ঘাটে বিছুটি ? এর পর বলবি মনুমেন্টের মাথায় কন্টিকারীর শেকড় ? কক্সকম্ব কোথাকার !"

বিল্টু গম্ভীর মুখে বলল, "তা হলে জুডোর উচিকোসি প্যাঁচ ঝাড়বার আগে শরীরটা কাঁপাচ্ছিল। তুমি যেমন যাত্রা দেখে ফেরার সময় সেই ষণ্ডা লোকটাকে দেখে করেছিলে। যেটাকে তোমার ভয়ের কাঁপুনি ভেবেছিলাম।"

মেজদা চটে গিয়ে বলল, "চুপ কর প্লাটিপাস। যা জানিসনে, তা নিয়ে কথা বলিসনে। সায়েবের তখন ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। ও তখন পাগলের মতো বুক পিঠ চুলকোচ্ছে, আর চিৎকার করছে, 'ও বাবু, সেভ মি, সেভ মি।' মামা বললেন 'ঠিক আছে, আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বোসো।'

"সায়েব তাই করল। মামা তখন ওর মাথায় আচ্ছাসে গাঁট্টা মারতে মারতে আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন। সায়েব ভাবল, এই বোধহয় মন্ত্র পড়ার রীতি।

"খানিকক্ষণ গাঁট্টা খাওয়ার পর সায়েব বলল, 'বাবু নট অন দি হেড, বাট হিয়ার।' অর্থাৎ, মাথায় নয়, এখানে, মানে বুকে আর পিঠে।

"মামা সড়াত করে ওর জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে কী যেন একটা বার করে শূন্যে হাতটা দুবার দুলিয়ে সায়েবের মাথায় ফুঁ দিয়ে বলল, 'কী সায়েব, এবার ঠিক হয়েছে তো ?'

"সায়েব হাঁফ ছেড়ে বলল, 'ও ইয়েস। আয়াম অলরাইট নাউ। বাবু, য়্যু আর গ্রেট।'

"তারপর ভোম্বলমামার সঙ্গে শেক-হ্যান্ড করে বলল, 'যদি কোনওদিন কোনও দরকার হয়, তা হলে ফোর্ট উইলিয়ম-এ আমার খোঁজ করবে। আমার নাম ক্যাপ্টেন ডগলাস। তবে একটা কথা। আমার অসুখটা কী হয়েছিল যদি বলে দাও, আমি আমার ভাই-বেরাদরদের কাছে গল্প করতে পারি।'

"ভোম্বলমামা বললেন, 'অসুখটার নাম নেংটিস ইন্ডারিকা।'

"সায়েব 'নেংটিস ইন্ডারিকা' নামটা মুখস্থ করতে করতে চলে গেল।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "কিন্তু মেজদা, নেংটিস ইন্ডারিকা রোগের নাম তো আমি জন্মেও শুনিনি।"

মেজদা বলল, "ওই নামে কোনও রোগ থাকলে তো শুনবি। ও নামটা ভোম্বলমামার আবিষ্কার। নেংটিস ইন্ডারিকা মানে নেংটি ইঁদুর। আউটরাম ঘাটের কার্নিস থেকে একটা নেংটি ইঁদুর ধরে সায়েবের জামার ভেতরে চালান করে দিয়েছিলেন।"

বিল্টু বলল, "তাই বলো।"

মেজদা বলল, "এতক্ষণ মগজে সেঁধোল ? হ্যাভাস-গাঙরামা, মানে হাঁদা গঙ্গারাম ?"

ছবি : প্রকাশ মাইতি

ভাগ্নে যাবে মামার বাড়ি

প্রণব মাইতি

ভাগ্নে যাবে মামার বাড়ি,
আহ্লাদে সাতখানা,
একখানা হাত ধরে আছে
গরম মিহিন্‌দানা।
চারখানা পা ছড়িয়ে ঘুমোয়
ঝোপের মধ্যে মামা,
ভাগ্নে ডাকে, "বেরিয়ে এসো
যাচ্ছে ছিঁড়ে জামা।"
মামা এলেন কালো-হলুদ
জোব্বা এঁটে গায়,
তাঁকে দেখে ভাগ্নে জগন্—
নাথের পেরান যায়।
ধুলোয় গড়ায় মিহিন্‌দানা
চাটতে থাকেন বাঘ,
মিষ্টি পেয়ে ফুর্তি কী তাঁর,
একটুও নেই রাগ।
মামা বলেন, "ভাগ্নে, শোনো,
মিষ্টি ভাল বটে,
কিন্তু ভাল করতে, যদি
আনতে ছাগের মেটে।"
ব্যাঘ্রমামার বাক্যি শুনে
ভাগ্নে জগন্নাথ,
লম্ফ দিল ঝোপ ডিঙিয়ে
লম্বা সাতাশ হাত।

ছবি : দেবাশিস দেব

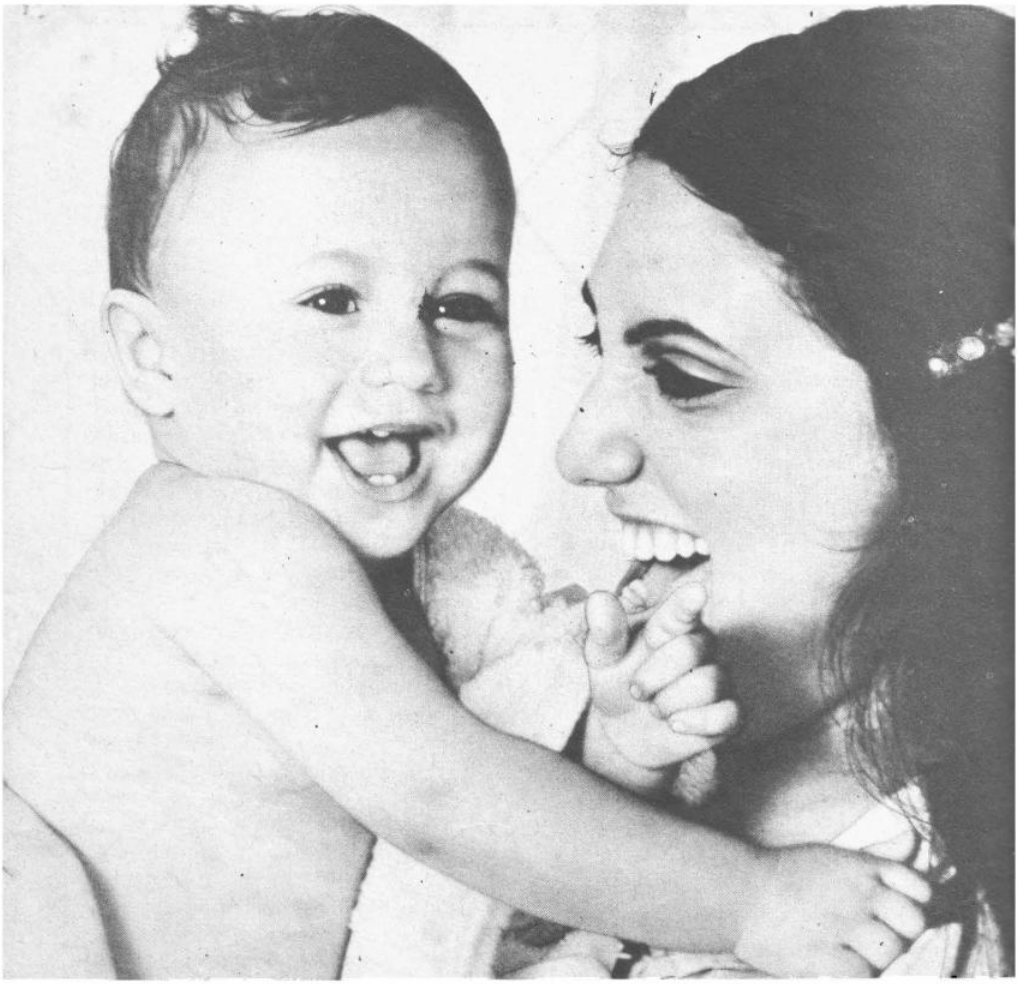

আপনার সোনাটির কোমল ত্বকে আপনার স্নেহ-মধুর চুম্বনের মতই দেয় এ এঁকে!

জনসন্স বেবী সোপ, ছোট্ট সোনাদের ছোট্ট দুনিয়ার নানান 'স্পেশাল' জিনিষের মধ্যে এটিরও একটি স্থান রয়েছে।
জনসন্স বেবী সোপ-এ ল্যানোলিন মেশানো থাকে ব'লে, এর পরশটি হয়ে ওঠে মায়ের মমতাভরা মৃদু-কোমল পরশের মতই। আর, এর কোমল-মধুর সুবাস, সারা অঙ্গে ঘিরে থেকে, সোনাটিকে মাতিয়ে রাখে শিশুসুলভ আনন্দের ধারায়!

জনসন্স বেবী সোপ
বিশুদ্ধ...মৃদু...নিরাপদ

Johnson & Johnson

© J&J

শ্রীচরণ না থাকলে

অলককিরণ দেব

ওড়িশার ঢেনকানল শহরের কাছেই একটি ছোট জায়গা। নাম কামাখ্যানগর। ব্রাহ্মণী নদী পেরিয়ে যেতে হয়। বর্ষার দিনে তাই সরাসরি যাওয়ার উপায় থাকে না। অনেক ঘুরে যেতে হয়। জায়গাটি ছোট হলেও বড়ই মনোরম। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়। দূর থেকে দেখা যায়, ফিকে নীল পাহাড়ের পাদদেশে ঘন সবুজ জঙ্গলের রাজত্ব। সেই কামাখ্যানগরের সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার অশোক। তার বউ রুপালিকে নিয়ে বছর দুয়েক হল সেখানেই আছে।

একদিন হাসপাতাল থেকে ফিরেই অশোক বলল, "আমায় একবার ভুবনেশ্বরে যেতে হবে। ডিরেক্টার অব্ হেল্‌থ সার্ভিসের অফিসে কিছু কাজ আছে।"

রুপালি জিজ্ঞেস করল, "কতদিনের জন্য যাচ্ছ?"

"দু'তিন দিন তো নিশ্চয়ই। তবে আমি ভাবছি অফিসের জিপ নিয়েই যখন যাচ্ছি, তখন ফেরার পথে নন্দনকাননটা একবার ঘুরে এলে কেমন হয়? তুমি তো নন্দনকানন দ্যাখোনি। আমিও বহুদিন যাইনি।"

রুপালি তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে ওঠে, "ভালই হবে! কবে যাব আমরা?"

"কালই বেরিয়ে পড়া যাক। দু'দিন কাজ করে রবিবার ফেরার পথে নন্দনকানন দেখে আসা যাবে। কী বলো?"

সেদিনই রাত্রে দরজায় করাঘাত। অশোক দরজা খুলে দ্যাখে, বারান্দায় কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীচরণ। বাজারের একটা চা-জলখাবারের দোকানে কাজ করে সে। গ্রামের দিকে কোথায় যেন বাড়ি। ঘুরতে-ঘুরতে এ-জায়গায় কী করে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। আগে একটা মোটর গ্যারাজে কাজ করত। গ্যারাজটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকদিন হল আছে সে এখানে। অশোকরা প্রায়ই ওর দোকান থেকে খাবার-টাবার আনায়। মোটামুটি চেনা মুখ। বাইশ-তেইশ বছরের স্বাস্থ্যবান যুবক এই শ্রীচরণ।

"হ্যাঁ, কী দরকার?" অশোকের প্রশ্ন।

"আজ্ঞে, আপনারা শুনলাম কাল রাজধানীতে যাচ্ছেন। আমায় একটু নিয়ে যাবেন?"

"তোমায়? কেন?"

"আজ্ঞে—মানে—রাজধানীটা তো দেখা হয়নি আমার। তা ছাড়া ···।" শ্রীচরণ আমতা আমতা করে।

অশোক বলে, "বলে ফেলো কী বলবে। আমার আবার কিছু গোছগাছ করতে হবে।"

"আজ্ঞে, নন্দনকাননটাও তো দেখিনি। তাই ভাবছিলাম দয়া করে যদি একবার নিয়ে যান আমায় কাল।" হাত কচলাতে থাকে শ্রীচরণ।

একটু বিরক্ত হয় অশোক। সে, রুপালি, ড্রাইভার জগন্নাথ ও চাপরাশি গজানন, এই চারজনেরই যাওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ একটা আপদ এসে হাজির হল। যত সব ঝামেলা।

"আমাকে স্যার দয়া করে নিয়ে যান। গরিব মানুষ আমি। আর কী করে যেতে পারব স্যার সেখানে?"

অশোক মাথা নাড়ে। মুখে স্পষ্টই বিরক্তির চিহ্ন তার। কী আর করা।

হিসেব-মতো দিন দুয়েকের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে গেল অশোকের। রবিবার সকাল আটটার মধ্যেই তারা বেরিয়ে

পড়ল নন্দনকাননের পথে। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি আধুনিক চিড়িয়াখানা। ভুবনেশ্বর থেকে খুব দূরেও নয়। খণ্ডগিরি-উদয়গিরির পাশ দিয়ে যাওয়া যায়। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছন দিয়েও খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায়। তা ছাড়া ট্রেনে গেলে 'বারং' স্টেশনে নেমে সেখান থেকে একটু হেঁটেও যাওয়া যায়। হরেকরকম গাছপালা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নন্দনকাননে। শীতকাল সবে শুরু হওয়ায় নানা রঙের ফুলের ছড়াছড়ি। নন্দনকাননের ভিতরেই সুন্দর রাস্তাঘাট। রেস্তোরাঁও রয়েছে। রাত কাটানোর জন্য আছে ছোট ছোট কটেজ। নানা জন্তু খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত রকমের যে পশু-পাখি আছে, তার হিসেব করা সম্ভব নয়। মস্ত একটা লেক রয়েছে। অশোকরা তাতে ঘণ্টাখানেক বোটিংও করল। টয়-ট্রেনে চড়ে একপাক ঘুরেও এল। অসাধারণ সুন্দর জায়গা। ছুটির দিন থাকায় বেজায় ভিড়। কোনও গাছের তলাই খালি নেই। টিফিন ক্যারিয়ার, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি, সমস্ত জায়গাটা সব মিলিয়ে জমজমাট। কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়ে সসঙ্কোচে শ্রীচরণ সব ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, এত সুন্দর একটা জায়গা থাকতে পারে।

দুপুরে নন্দনকাননেই খাওয়া-দাওয়া হল। তারপর বিকেল তিনটে নাগাদ অশোকরা বেরিয়ে পড়ল কামাখ্যানগরের পথে। জিপের পিছনে একই রকম সংকুচিতভাবে শ্রীচরণ বসে আছে। যা দেখল, হয়তো সেটা তার সারা জীবন মনে থাকবে। তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে জিপ। চওড়া রাস্তা। চৌদ্দার পার হওয়ার পর ধীরে ধীরে জঙ্গলের রাজত্ব। প্রায় ঢেনকানালের কাছাকাছি পর্যন্ত জঙ্গলের ধার দিয়েই রাস্তাটা চলে গেছে।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জিপটা থেমে যায়। ড্রাইভার জগন্নাথ চেষ্টা করে চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করার। কিন্তু না, কিছুই হল না। সবাই গাড়ি থেকে নেমে এল। এতক্ষণ বোঝা যায়নি, এবারে বাইরে তাকিয়ে অশোকরা লক্ষ করল, চারদিকে বেশ ঘন জঙ্গল। ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজে। তা হলেও একটু-একটু অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বেশ নির্জন রাস্তা। শ্রীচরণ এবার বনেটটা খুলে তার টানাটানি করল। একবার স্টার্ট দেবার চেষ্টাও করল। কিন্তু কোনও লাভ হল না। অশোক চিন্তিত মুখে এ-দিক ও-দিক তাকায়। একটু এগোতেই চোখে পড়ল, বড়-রাস্তার ধার দিয়েই ফরেস্ট বিভাগের ঢালু রাস্তা সোজা জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে। হঠাৎ অশোক বলে ওঠে, "গাড়িটাকে এখানে এনে এই ঢালু রাস্তায় ঠেলে দিলে কেমন হয়, জগন্নাথ ?"

জগন্নাথ রাস্তাটা দেখে নিয়ে বলে, "মন্দ হয় না, স্যার। ঠেলেই দেখা যাক্। স্টার্ট হয় কি না।"

শ্রীচরণ, চাপরাশি গজানন ও অশোক নিজেই জোরে ঠেলে দেয় জিপটাকে সেই ঢালু রাস্তা দিয়ে। জিপটা রাস্তা দিয়ে দ্রুত গতিতে নীচে নেমে যায়। কিন্তু চালু এবারও হল না। তারা সবাই জিপের কাছে পৌঁছয়। বিপর্যস্ত বোধ করে সবাই। অন্ধকারও ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে। বিপদের উপরে বিপদ, জিপটা একেবারে জঙ্গলের মধ্যেই পড়ে গেল। পাঁচ ব্যাটারির একটা টর্চ জ্বেলে শ্রীচরণ চট্‌পট্ কার্বুরেটারটা খুলে ফেলল। সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখল সে। তেল তো মোটেই আসছে না সেখানে ! তবে কি পাম্পে গোলমাল ?

"জগন্নাথদা, পাম্পটা একবার খুলেই দেখা যাক্।" শ্রীচরণ প্রস্তাব দেয়।

"খোলাই যাক তা হলে !" জগন্নাথ রীতিমত ভাবিত।

অশোক আর রুপালি একটা গাছের নীচে বসে রয়েছে। আরও ঘণ্টা দেড়েকের মতো সময় লাগবে পৌঁছতে। তা হলেও জিপটা ঠিক হোক তো প্রথমে। শ্রীচরণ খুলতে শুরু করেছে পাম্পটা। নিস্তব্ধ পরিবেশ। আধো-অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে বড় বড় গাছ।

হঠাৎ অশোকের পাশ থেকে খসখস আওয়াজ। সেদিকে তাকিয়েই তারা আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। মৃত্যুদূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো ভালুক। আবছা অন্ধকারের মধ্যে আরও একরাশ অন্ধকার সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেটা। কালো মুখের মধ্যে সাদা তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। মুখে ঘড়ঘড় আওয়াজ। সামনের দুটো কালো লোমশ হাত মুষ্টিবদ্ধ। অশোকরা বোধহয় জ্ঞানই হারিয়ে ফেলত। হঠাৎ শ্রীচরণ এক লাফে তাদের ও ভালুকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার ও ভালুকের মধ্যে ফুট দশেকের ব্যবধান। হঠাৎ ভালুকটা বিকট চিৎকার করে লাফিয়ে পড়ে শ্রীচরণের ওপর। শ্রীচরণ যেন জানত, এইরকম হবে। চট করে সে একপাশে সরে যায়। ভালুকটা তার ভারী শরীর নিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে শক্ত মাটির ওপর। কিন্তু আবার সেটা তড়াক করে উঠে লাফ দেয় শ্রীচরণকে লক্ষ করে। দুই হাতে ভালুকের সামনের দুটো হাত শক্ত করে ধরেই শ্রীচরণ তাকে এক ঝটকায় হটিয়ে দেয় একপাশে। ভালুকটা ডিগবাজি খেয়ে আবার মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। ভালুকটা ফের উঠে দাঁড়াবার আগেই শ্রীচরণ এক লাফে তার ওপর পড়ে দুটো সামনের হাত শক্ত করে ধরে পিঠের দিকে বাঁকিয়ে নেয়। ভালুকটা হাত দুটো ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করা চিৎকারের মধ্যে মটমট আওয়াজে বোঝা যায় তার হাতের হাড় ভেঙে গেল। বড়ই শক্ত, কঠিন পাল্লায় পড়েছে সে ! হঠাৎ হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে শ্রীচরণ তার দুই হাত মুঠো করে ভালুকটার ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে উপর্যুপরি কয়েকটি আঘাত করল। একবার, দু'বার, ছ'বার ! নেতিয়ে পড়ে ভালুকটা। মুখটা 'হাঁ' হয়ে যায়। শ্রীচরণ উঠে পড়ে। হাঁপাচ্ছে সে। গায়ের ছেঁড়া শার্টের ফাঁক দিয়ে তার পেশিবহুল, ঘর্মাক্ত শরীর দেখা যাচ্ছে। বুকে-হাতে ভালুকের আঁচড়ের রক্তাক্ত দাগ।

"বুনো ভালুক এ দিকের জঙ্গলে আছে জানতাম না, স্যার। তা ছাড়া ভালুকটার দাঁত আর নখ দেখছেন কি ?" শ্রীচরণ ধীরে ধীরে বলে। "যাই হোক, ঘণ্টা দুই-তিনের জন্য নিশ্চিন্ত। পাম্পটা এবার দেখা যাক। মনে হয়, ওখানেই গোলমাল আছে। ফেরার পথে কিন্তু ফরেস্ট অফিসে খবর একটা দিয়ে দেওয়া দরকার।"

আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাম্পটা ঠিক করে দেয় শ্রীচরণ। গাড়িটা নির্বিঘ্নে ঢেনকানলের পথে ছুটে চলেছে। অশোক আর রুপালি কোনও কথাই বলতে পারছে না। চুপ করেই তারা তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। অশোক বোধহয় ভাবছে যে, এই লোককে সে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে চায়নি। না-আনলে আজ আর তাদের নিস্তার ছিল না।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাংশু…প্রাহ্ণ…

যে অলস, তার অর্জিত ধন-সম্পদ কম। আর তার শব্দ-সম্পদেও একই দুরবস্থা। তার আচারে ব্যবহারে যেমন দৈন্য স্পষ্ট, তার বাক্যেও তেমনি চরম দারিদ্র্য। একটু ইচ্ছায় অল্প আয়াসেই কিন্তু এই আলস্য দূর করা যায়। নীচের প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **প্রাংশু**—(ক) ফ্যাকাসে, (খ) শক্তিহীন, (গ) খর্ব, (ঘ) দীর্ঘ।

২। **কৃতি**—(ক) সফল, (খ) কাজ, (গ) কুশল, (ঘ) গুণবান।

৩। **প্রাহ্ণ**—(ক) পূর্বদিন, (খ) বিকাল, (গ) পরদিন, (ঘ) সকাল।

৪। **বল্লী**—(ক) শাখা, (খ) লতা, (গ) পুষ্প, (ঘ) বলবান।

৫। **কাদম্বিনী**—(ক) কদমফুল, (খ) কলহংসী, (গ) কদম্ববৃক্ষ, (ঘ) মেঘশ্রেণী।

উত্তর : ১। **প্রাংশু**—(ঘ) দীর্ঘ ; উন্নতকায়। যেমন, 'শালপ্রাংশু', অর্থাৎ শালগাছের মতো দীর্ঘকায়। 'এই প্রাংশুলভ্য ফলের লোভেই আমি উদ্বাহু বামনের বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছিলাম' (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। এর অর্থ, যে ফল দীর্ঘকায় ব্যক্তির প্রাপ্য, তার লোভে বামন হয়েও আমি হাত বাড়িয়েছিলাম।

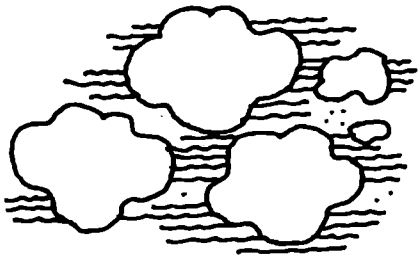

২। **কৃতি**—(খ) কাজ। যেমন—'কৃতির পুরস্কার সকলের ভাগ্যে জোটে না।'

৩। **প্রাহ্ণ**—(ঘ) সকাল। যেমন, 'আমরা প্রাহ্ণে অপরাহ্ণে শীতল বায়ু সেবন করিতাম' (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)।

৪। **বল্লী**—(খ) লতা। যেমন, 'মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ' (রবীন্দ্রনাথ)।

৫। **কাদম্বিনী**—(ঘ) মেঘশ্রেণী। শুক্লবর্ণ কদম্বফুলের মতো দেখায় অথবা কদম ফুল ফোটায় সাহায্য করে বলে মেঘের এই নামকরণ। যেমন, 'গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী' (মধুসূদন দত্ত)।

দেব-সেনাপতি

ভাইফোঁটার আগে

সামনে ভাইফোঁটা। প্রত্যেক বছর ভাইফোঁটার আগে ভাই-বোনে এ-রকম কথা-বার্তা হয় :

"What are you going to give me this Brothers' Day, Dada?" Chameli would ask.

"My blessings," Chambal would reply gravely. "You'll touch my feet, and I'll bless you in return. If you lay some offering at my feet too, I'll be pleased to accept it."

"What kind of offering?" Chameli would ask with equal gravity.

"Say, two dozen silk handkerchiefs."

"And all I get in return is your blessings? Be fair, throw in a diamond necklace, or at least a gold ring, won't you?"

"Where's the silver hair-clip I gave you last year?"

"Silver hair-clip? It was stainless steel."

Chambal would try to look surprised.

"You don't say! Then that fellow at the shop cheated me. I paid four rupees and fifty paise for it. All right, he'll not fool me again. I'll give you a stainless steel table-spoon. You're so fond of eating, I'm sure you'll find it very useful."

এ-বছরও দু'জনে এই রকম কথাবার্তা হচ্ছিল।

Mr Roy was dozing in his big leather arm-chair. But he must have caught a little of the conversation, for he suddenly opened his eyes and said, "Do you children know what your auntie gave me the year before she died? It was a beautiful gold-nib fountain-pen. I lost it a long time ago."

এবারে যেটা তোমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ করতে বলছি, তা হল ইংরেজিতে বিশেষ্য-পদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার :

Silk handkerchief; diamond necklace; gold ring; silver hair-clip; stainless steel spoon; leather arm-chair; gold-nib fountain-pen.

প্রসাদ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)

পুরী প্যাসেঞ্জার

রতন ভট্টাচার্য

॥ ৩ ॥

আমাদের মার্ক ফোর হাইওয়ে দিয়ে ছুটছিল। বাবা বলেছেন বাউড়িয়া পৌঁছতে মিনিট-পঁচিশ লাগবে। এদিকের রাস্তাঘাট বাবার সব চেনা। কত দূর-দূর থেকে বাবার কাছে রুগি আসে, বাবাকে কলে যেতে হয়। এই রাস্তাটা অবশ্য আমারও চেনা। এটা ছ' নম্বর জাতীয় সড়ক। এখানকার লোকেরা বলে বোম্বে রোড। পিসিমার বাড়ি যেতে হলে এই আমাদের রাস্তা। তা ছাড়া পাঁচবার যে দিঘা গেছি তাও এই রাস্তা দিয়ে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা দু-ভাবে হাইরোডে পড়তে পারতাম। এক, রাজবাড়ির দিক দিয়ে। দুই, স্টেশন রোড হয়ে খানিকটা পিছিয়ে। আমরা অবশ্য স্টেশন রোড দিয়ে খানিকটা পিছিয়ে এসেই হাইরোডে পড়েছি। রাজবাড়ির দিকে যাইনি। বাবা বলেছিলেন, "ওদিকে এখন সন্ধেবেলা অসম্ভব ভিড়। রাস্তাও সরু। গাড়ি বার করতে হিমসিম খেয়ে যেতে হবে।"

বেশ কিছুক্ষণ হল আমরা আন্দুল শহর পেছনে ফেলে চলে এসেছি। এখন রাস্তার দু'পাশে শুধু অন্ধকার মাঠ। রাস্তায় লোকজন নেই। সামনে, পেছনে, কাছে খালি হেডলাইটের তীব্র আলো। সাঁই-সাঁই করে পাশ দিয়ে অনবরত হেভি হেভি ট্রাক বেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে বাস, মিনিবাস। ধুলোগড় চৌরাস্তা ছাড়াতেই মাঠের মধ্যে অন্ধকারে আলো-ঝলমল একটা সিনেমা হল দেখলুম আমরা। পাশে একটা বরফ-কল আর পেট্রোল পাম্প।

বুড়িকে খুঁজতে এইভাবে যাওয়াটা ভারী অদ্ভুত লাগছিল আমার। এটাকে প্রায় অভিযান বলা চলে। উত্তেজনায় আমার গলার কাছটা টনটন করছিল। দেখতে গেলে আজকে সারাটা দিনই প্রায় উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কাটছে আমার। সন্তুর কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া, অসময়ের ঝড়বৃষ্টি, বাঙ্কের সেই লোকটা, পুলিশ, সোনার গণেশ, সবকটি ঘটনাই উত্তেজনাপূর্ণ। তার ওপর এখন চলেছি বুড়ির সন্ধানে। কী জানি কী আছে ভাগ্যে আমার। বুড়িকে যদি ভালয়-ভালয় পাওয়া যায়, মানে সুস্থ অবস্থায়, তবেই বাঁচোয়া, আর যদি দেখা যায় বুড়ি প্লাটফর্মের ওপর মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে তা হলে আর বাবার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারব না।

গাড়ি রানিহাটি এসে পড়ল। আন্দুলের পর এই রাস্তায় এই প্রথম একটা জাঁকজমকপূর্ণ এলাকা। মেলাই দোকানঘর। দোকানগুলো যেন হাইরোডের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

লোকজনও তেমনি। গিসগিস করছে একেবারে। এখান থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে আমতায়। এ জায়গাটার তাই আর একটা নাম আমতা রোড। এখানে বাবাকে গাড়ির স্পিড্ কমাতে হল। অবশ্য অল্পক্ষণ। মোড় ছাড়িয়ে গেলে একটা সিনেমা হল। তারপরই রাস্তা আগের মতো।

তবে খুব বেশিক্ষণ আর হাইরোড দিয়ে যেতে হল না আমাদের। রানিহাটি ছাড়াবার পর পাঁচ থেকে সাত মিনিট। পাঁচলার মোড়ে পৌঁছে দেখলাম আমরা এখান থেকে বাউড়িয়ার রাস্তা বেরিয়ে গেছে। গাড়ি বাঁ দিকে বাউড়িয়ার রাস্তায় ঢুকিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, "এসে গেছি রে সন্দীপ। আর একটুখানি। কিন্তু যার জন্যে আসা সেই তোর বুড়ি কী অবস্থায় আছে কে জানে?"

আমি কিছু বললাম না। কী বলব? চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। এই রাস্তাটায় আগে আর কোনওদিন আসিনি। তেমন চওড়া নয় রাস্তা। দু'পাশে বাড়িঘর, বাগান। রাস্তার ধারে-ধারে আগাগোড়াই একটা খাল চলল। এমনিতে অন্ধকার, কিন্তু বাড়িঘর থেকে ছিটকে আসা আলোয় অল্পস্বল্প দেখতে পাচ্ছিলাম সব।

আমাদের প্রায় দশ মিনিট লাগল বাউড়িয়া পৌঁছতে। নতুন এবং অজানা রাস্তা বলে বাবা তেমন জোরে চালাতে পারেননি। আমার মনে হল জোরে চালালে মিনিট পাঁচেক লাগত। রাস্তাটা সোজা লাইনধার বরাবর এসে বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে। বাঁ দিকে অনেক দূরে লেভেলক্রসিং দেখা গেল। ডান দিকে স্টেশন। বাবা প্রথমে ভেবেছিলেন লেভেলক্রসিং পার হয়ে একদম স্টেশনে বুকিং অফিসের সামনে নিয়ে দাঁড় করাবেন গাড়ি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করলেন না। বললেন, "এক কাজ করি আয়। গাড়িটা এদিকেই রাখি। বুড়িকে কোথায় পাব, তার তো ঠিক নেই। যে প্লাটফর্মে নেমেছিল যদি সেই ডাউন প্লাটফর্মেই পাই, তা হলে অযথা আবার ওভার ব্রিজ পার হতে হবে না।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। তাই রাখো।"

অবশ্য গাড়ি এদিকে রাখতেও ঝঞ্ঝাট হল খুব। রাস্তার ওপর লাইনের ধারে বাজার। দু'পাশে এককাঁড়ি দোকানঘর। খাবারের দোকান। সাইকেলের দোকান। তা ছাড়া রাস্তার অর্ধেক জুড়ে সাইকেল-রিকশার স্ট্যাণ্ড। লাইন দিয়ে প্রায় আট-দশখানা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। বাবাকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে যেতে হল। দোকানঘরগুলো যেখান থেকে শুরু হয়েছে তারও আগে বাঁ দিকে অনেকখানি সরিয়ে গাড়ি রাখলেন বাবা। রাস্তা দিয়ে মাঝেমধ্যেই লরি যাচ্ছে। বাউড়িয়া শহরে গঙ্গার ধারে-ধারে নাকি চারটে মিল আছে। সেই মিলের লরি। বাসও নাকি চলে এই রাস্তায়। চলতে পারে। আমি কিন্তু একটাও দেখিনি এখনও পর্যন্ত!

গাড়ি রেখে আমরা লাইনের ওপর দিয়ে প্লাটফর্মের দিকে এগিয়ে চললাম। বাবা তাঁর দরকারি ওষুধের বাক্সটা সঙ্গে নিয়ে নিয়েছেন। আমাদের পেছন দিকে দূরে সিগন্যালের লাল-নীল চোখ, কেবিন এবং লেভেলক্রসিং, সামনে স্টেশন। এখানে রেলরাস্তা বেশ চওড়া। কমপক্ষে পাশাপাশি সাত-আটটা লাইন। সামনে দুটো প্লাটফর্ম দেখতে পাচ্ছিলাম। বাঁ দিকে অফিসঘরের পাশে যে প্লাটফর্ম, সেটা সেই বিকেলের মতোই মালগাড়ি দিয়ে আড়াল করা। অল্প দূর থেকে প্লাটফর্ম দুটোকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। তেমন লোকজন নেই। অনেকগুলো টিউবলাইট জ্বলছে। দুটো করে চারটে টিনের শেড। চমৎকার একখানা ছবি যেন। আমার ভেবে খুব মজা লাগছিল যে, আজই ঘণ্টাদুয়েক আগে আমি এইখান দিয়ে গেছি। ওই প্লাটফর্মে আমাদের গাড়িটা থেমে ছিল।

বাবা প্রথমে ডাউন প্লাটফর্মটা দেখলেন। এ মাথা দিয়ে উঠে ও মাথা পর্যন্ত হেঁটে চলে গেলাম আমরা। খুব বেশি লোক নেই। দু-চারজন প্যাসেঞ্জার বসে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। চায়ের দোকানের উনুন ঘিরে গুলতানি করছে কয়েকজন। আজ ঠাণ্ডাটাও পড়েছে বেশ। বোধহয় রাধামোহনপুরের সেই ঝড়বৃষ্টির জন্যেই ঠাণ্ডাটা হঠাৎ বেড়ে গেছে এভাবে। কিংবা কে জানে আমি তো এখানে ছিলাম না, হয়তো এরকম ঠাণ্ডাই চলছে ক'দিন ধরে।

ডাউন প্লাটফর্ম দিয়ে হেঁটে যাবার সময় আমি বাঁ দিকে আপ প্লাটফর্মটার দিকেও চোখ রেখেছিলাম। বুড়িকে চোখে পড়েনি। অবশ্য ওদিকটায় প্যাসেঞ্জার অনেক বেশি। কোথায় কোন ঘুপচিতে বুড়ি পড়ে আছে এতটা দূর থেকে ঠিকমতো দেখা সম্ভব না। বিশেষ করে রাত্রিবেলা। ওভারব্রিজ অনেক পেছনে। বাবা তাই লাইন ডিঙিয়ে আপ প্লাটফর্মে উঠবেন ঠিক করলেন। তেমন একটা অসুবিধে হল না। বাবা আগে উঠে আমাকে হাত ধরে টেনে তুললেন। আমি অবশ্য একাও উঠতে পারতুম।

কিন্তু এ প্লাটফর্মেও বুড়ি নেই। সমস্ত প্লাটফর্মটা ঘুরে দেখে নিয়ে বাবা বললেন, "বুড়িটা গেল কোথায় রে সন্দীপ?"

আমি বললাম, "হাওড়া চলে যেতে পারে।"

"তা পারে। আবার উল্টোদিকের গাড়ি চেপে খড়্গপুরও যেতে পারে।"

আমরা যখন কথা বলছি তখন হাওড়া থেকে একটা লোকাল ট্রেন এল। চার-পাঁচ মিনিটের জন্যে প্লাটফর্মটা হয়ে গেল মাছের হাট। গাড়ি অবশ্য এক মিনিট বাদেই ভোঁ দিয়ে ছেড়ে দিল। কিন্তু খাঁচার মতো ওভারব্রিজ দিয়ে ওপরে উঠে লোকজনের বেরিয়ে যেতে যেতে প্রায় পাঁচ মিনিট। লাইন দিয়েও নেমে গেল অনেক লোক। ওরা মনে হয় আমাদের সেই রাস্তাটায় যাবে, যে রাস্তায় আমরা গাড়ি রেখে এসেছি।

লোকজন বেরিয়ে প্লাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেলে বাবা বললেন, "বাকি আছে এক নম্বর। চল, এবার এক নম্বরটা দেখি।"

লাইনে মালগাড়ি থাকায় এবার আমাদের ওভারব্রিজ দিয়ে পার হতে হল। এক নম্বর প্লাটফর্ম একদম ফাঁকা। একটাও লোক নেই। আলোও বেশি নেই। ওভারব্রিজ দিয়ে নেমে অফিস পর্যন্ত যাবার রাস্তাটুকুতে শুধু আলো। বাদবাকি প্লাটফর্মের সবটাই প্রায় অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কালো পাঁচিলের মতো দু'খানা মালগাড়ি। কিন্তু কোথাও বুড়ি নেই। অন্ধকার এবং আলো সবটাই ঘুরে ঘুরে দেখলাম আমরা। কিন্তু বুড়িকে পেলাম না। বাবা অন্ধকারে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে আমার কাঁধে হাত রেখে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "তোর মায়ের সঙ্গে তখন শুধু শুধু তর্ক করলাম। পৃথিবীর লোকজন বোধহয় ভাল হয়ে যাচ্ছে রে সন্দীপ।" মুহূর্তের জন্যে থামলেন বাবা। থেমে বললেন, "তবু চল, একবার অফিসটায় জিজ্ঞেস করি। দেখি ওরা কিছু জানে কি না।"

আমি ঢোঁক গিলে বললুম, "বাবা, বুড়িটা এর মধ্যে মরে যায়নি তো ?"

বাবা অন্যমনস্ক গলায় বললেন, "তা যেতে পারে। কিন্তু তা হলে ডেড্‌বডি কোথায় ?"

স্টেশনের অফিসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, "ওরা হয়তো সরিয়ে ফেলেছে।"

"তবেই হয়েছে। মিনিমাম দশ ঘণ্টা। এইসব পাবলিক প্রসে কেউ মরলে ডেড্‌বডি সরাতে দশ থেকে পনেরো ঘণ্টা সময় লাগে। চল দেখি অফিসে একটু জিজ্ঞেস করে ফিরে যাই। ফিরে গিয়ে আবার থানায় যেতে হবে। মনে আছে তো, আশি হাজার টাকা !"

আমি মাথা নাড়লাম। স্টেশনের অফিস কাছেই। বাঁ দিকে ওয়েটিংরুমে ঢোকার রাস্তা, তারপরেই অফিস। ক' পা হেঁটে অফিসের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। ঠিক দরজার মুখটাতে টেবিল পেতে তার ওপর তিন-চারটে ফোন সাজিয়ে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। আমি জানি ইনি এ. এস. এম.। টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে একটা খাতায় তিনি যেন কী লিখছিলেন। বাবা তাঁর সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "শুনছেন ! বিকেলের দিকে এদিকে কোনও বুড়িকে দেখেছেন ? মানে কোনও খোঁজ-খবরের জন্যে এসেছিল কি আপনার কাছে ? মোটাসোটা চেহারা, ময়লা কাপড়, কাঁচা-পাকা চুল। পানাসি যাবে।"

"কোথায় ?"

"পানাসি।"

ভদ্রলোক লেখা থামিয়ে মুখ তুললেন। "পানাসি-টানাসি জানি না। একটা বুড়িকে দেখেছি। একটা অদ্ভুত ভিখিরি বুড়ি। ঘণ্টা দেড়েক আগে···।"

বাবা তাঁকে শেষ করতে দিলেন না। তার আগেই বলে উঠলেন, "ভিখিরি ! তা ভিখিরি যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু অদ্ভুত কেন ?"

"আর বলবেন না !" অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন, "দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। নড়ে না। জিভে জড়িয়ে জড়িয়ে হিন্দিতে কী বলে বুঝতে পারি না। শেষে পাপ বিদেয় করবার জন্যে পকেট থেকে যেই দশটা পয়সা বার করে দিলুম, হাতে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। অদ্ভুত না ?"

বাবাও খুব বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলেন, "বেশ। অদ্ভুত। কিন্তু তারপর সে কোথায় গেল ?"

"তা মশাই জানি না। ওই বাইরে ফেলারাম আছে, ওকে জিজ্ঞেস করুন। ও 'হ্যাট হ্যাট' করে তাড়াচ্ছিল দেখেছি।" কথা শেষ করে ভদ্রলোক নিজেই 'ফেলারাম, ফেলারাম' বলে চেঁচিয়ে ডাকলেন দুবার। ফেলারামও যেন দরজার বাইরেই অপেক্ষা করছিল। মুহূর্তের মধ্যে ঘরে ঢুকে বলল, "ডাকছেন বাবু ?"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, তুই যে বুড়িটাকে তখন তাড়ালি, ওঁরা তার খোঁজ করছেন। যা জানিস বল।" টেবিলের নীচে কোথাও 'ক্রিড়িং-ক্রিড়িং' শব্দে একটা বেল বেজে উঠল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি একখানা ফোন তুলে নিয়ে ভীষণ চেঁচামেচি করে বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ, বাউড়িয়া ! হ্যাঁ। হ্যালো ! পি ফিফ্‌টি মিড্‌ল লাইনে ? অ্যাঁ ! মালগাড়ি ?"

ফেলারাম আমাদের ঘরের বাইরে নিয়ে এসে বলল, "সেই বুড়িটা তো একটা আস্ত পাগল বাবু। আমি যত 'হ্যাট হ্যাট' করি, সে খালি আঁচল দিয়ে চোখ মোছে আর কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে ছাই কী বলে কিছুই বুঝি না। চা খাচ্ছিলাম। চায়ের ভাঁড়ে করে ঠাণ্ডা জল খানিকটা ছিটিয়ে দিতে তবে নড়ে। যায়নি কোথাও। কোনও ঘুপচি-টুপচির মধ্যে বসে আছে দেখুনগে। স্টেশন তো পাগলদেরই আড্ডা। এই ঘরটা দেখেছেন ভাল করে ? ওয়েটিংরুম ?" ফেলারাম হাত তুলে

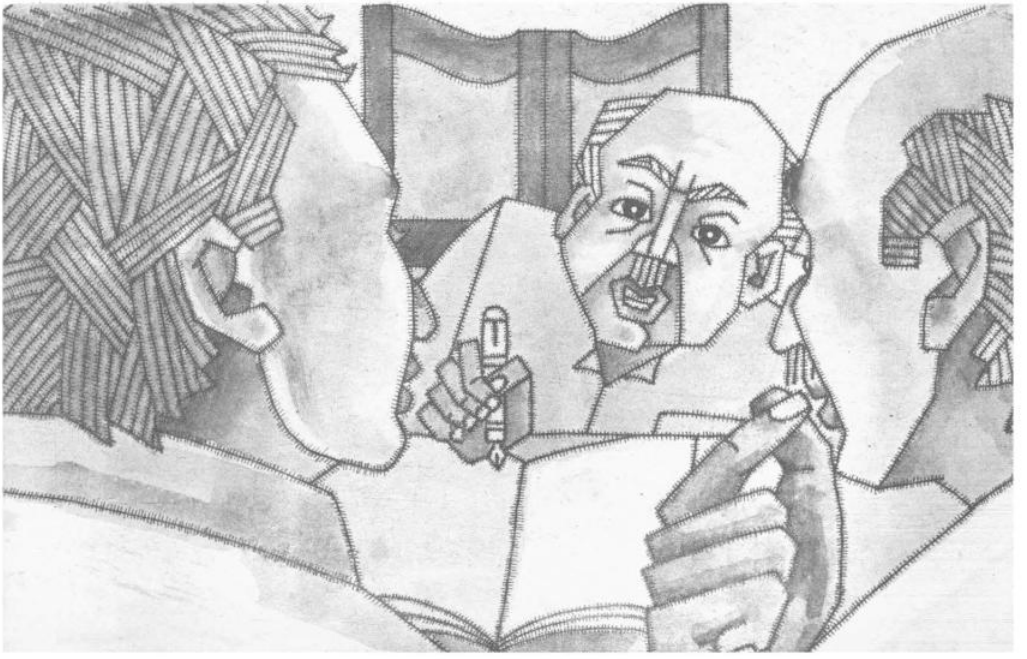

এমন সাদা, যেন নতুন!

ধোলাইয়ের পর ধোলাই...প্রতি ধোলাই!
পাওয়ার প্যাক্‌ড সার্ফ -এর ধোলাই এমন সাদা, যেন নতুন!

প্রতিটি শার্ট, প্রতিটি চাদর রাখে তেমনিই তাজা, তেমনিই ধবধবে সাদা.....যেন সদ্য কেনা প্যাকেট থেকে বার করা।

কারণ, পাওয়ার প্যাক্‌ড সার্ফ এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো..... অনেক শক্তিশালী, অনেক রক্ষাকারী। এতে রয়েছে এমন শক্তি যা কাপড়ের গভীরে পৌঁছে সাফ করে, আর এখন এতে ফেনাও রয়েছে অনেক বেশী।

সার্ফ কাপড়ের বেয়াড়া ময়লাও তুলে বার করে দেয়– তাই শুভ্রতাও হয় দীর্ঘস্থায়ী—আর, সার্ফ কাপড় রাখে সুরক্ষিত.....সবসময় নতুনের মত। সাদা, রঙীন, বিশিষ্ট বা আটপৌরে—সবকিছুকেই সার্ফ করে রাখে—সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে সাদা.....নতুনের মত সদাসর্বদা!

ধোলাইয়ের তো হাজার পাউডার আছে, কিন্তু পরিবারের সবার জামাকাপড়ের জন্যে আপনার ভরসাযোগ্য হ'ল – একমাত্র সার্ফ!

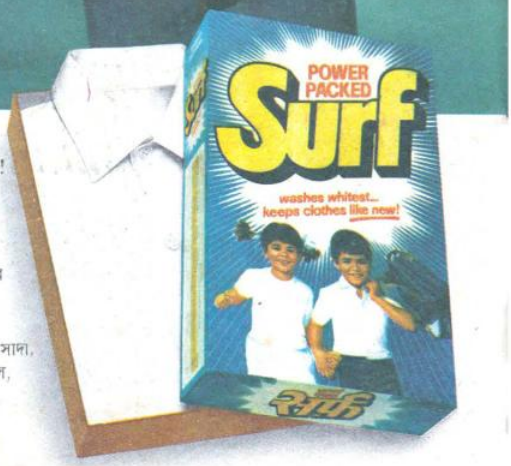

সার্ফের ধোলাই সবচেয়ে সাদা, কাপড় নতুন দেখায় সদা!

হিন্দুস্তান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS SU 317 2720 BG

ওয়েটিংরুমটা দেখাল আমাদের।

বাবা তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু নড়লেন না। "দাঁড়ান বাবু, আমি দেখি।" বলে ফেলারাম নিজেই ঢুকে গেল ওয়েটিংরুমে। বাবা কেন নড়লেন না, আমি জানি। বাবা এখন ভীষণ রেগে গেছেন। নিষ্ঠুর কাজকর্ম বাবা একদম সহ্য করতে পারেন না। আমারও খুব রাগ হয়ে গেল। একটা বুড়িমানুষ, যে কিনা কাঁদছে, তার গায়ে কেউ জল ছিটিয়ে দেয়? তাও শীতের মধ্যে? ভাল হয়েছে যে ফেলারাম নিজেই সরে গেছে। না হলে বাবার যা রাগ আর গায়ে যা জোর, বলা যায় না, ফেলারামকে হয়তো উঁচু করে ছুঁড়েই ফেলে দিতেন।

"আরে এই তো বুড়িটা শুয়ে আছে এখানে! এদিকে আসুন। বাবু! এদিকে।" ফেলারামের গলা। ওয়েটিংরুমের ভেতর থেকে ডাকছে। তাকে দেখা গেল না, কিন্তু তার গলা শোনা গেল। বাবা প্রায় লাফিয়ে উঠে আমায় ডাকলেন, "সন্দীপ!" তারপর আমার হাত ধরে এক টান মেরে ছুটলেন ওয়েটিংরুমের দিকে। আমিও ছুটলাম। কিন্তু ভেতরে পা দিয়েই থমকে যেতে হল। ফেলারাম কোথায়? ডান দিকে বুকিং-কাউন্টার আর মাল ওজনের যন্ত্র। যেমন থাকে সব স্টেশনে। উল্টোদিকে পিচের রাস্তা। বাবা যে তখন গাড়ি নিয়ে লেভেলক্রসিং পার হয়ে আসবেন বলেছিলেন, এলে বোধহয় ওই রাস্তাটায় রাখতেন গাড়ি। রাস্তার দিকের দেওয়াল বরাবর লম্বা টানা সিমেন্টের বেঞ্চি। সেখানে পাঁচ-সাত জন ভবঘুরে লোক বসে আছে। কিন্তু ফেলারাম কোথায়?

তৎক্ষণাৎ আবার গলা পাওয়া গেল ফেলারামের। "বাঁ দিকে চলে আসুন। দেওয়ালের এপাশে।"

দেওয়াল ঠিক নয়। থামের সঙ্গে দেওয়ালের খানিকটা ফালি ঢুকে গেছে ঘরটার মধ্যে। আর তাইতেই বাঁ দিকটা কীরকম আড়াল পড়ে গেছে। ঢুকেই দাঁড়িয়ে না পড়ে আমরা যদি ঘরের আরও খানিকটা ভেতরে চলে যেতাম, তাহলে দেখতে পেতাম ফেলারামকে। ওদিকেও একটা অফিস আছে। গুড্‌স অফিস। তার থেকে সামান্য তফাতে একমানুষ উঁচু প্রকাণ্ড একটা কাঠের বাক্স। ফেলারামের ডাকে ছুটে গিয়ে আমরা সত্যি সত্যি বুড়িটাকে দেখতে পেলাম। গুড্‌স অফিসের আর সেই একমানুষ উঁচু কাঠের বাক্সের মাঝখানের ফাঁকটুকুতে পড়ে আছে। ঠাণ্ডায় কুঁকড়েমুকড়ে এতটুকু হয়ে আছে বুড়ি। বেঁচে আছে কি না বোঝা গেল না। তা সত্ত্বেও বুড়িকে দেখামাত্র ভীষণ শব্দে হঠাৎ বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে উঠল আমার।

ফেলারাম জিজ্ঞেস করল, "কী বাবু, এই বুড়িটা তো?"

বাবা আমার মুখের দিকে তাকালেন এবং তাকিয়েই বুঝতে পেরে গেলেন যে এই বুড়িটাই। তাই ফেলারামের কথার কোনও জবাব দিলেন না বাবা। হাত থেকে ওষুধের বাক্স নামিয়ে ঝপ্ করে বসে পড়লেন বুড়ির পাশে। তাড়াতাড়ি তার একখানা হাত হাতে তুলে নাড়ি দেখতে লাগলেন। বাবা বুড়ির নাড়ি টিপে বসে আছেন আর আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। বাঁচবে তো! বেঁচে আছে তো! স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না। কিছু একটা করবার জন্যে ভেতরটা আমার ছটফট করছিল। অথচ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না আমার। কতক্ষণ এইভাবে কেটেছিল কে জানে। বাবা পরে বলেছিলেন, দু-তিন মিনিট। কিন্তু আমার ধারণা আরও বেশি। শেষে তার হাত ছেড়ে দিয়ে বাবা যখন তাকে আলতো ঠেলা মেরে হিন্দিতে বলতে লাগলেন, এ-ই! ওঠো ওঠো। এই বুঢ়টি! তুম্ পানাসি নেই যাওগে?" তখন যেন ঘোরটা কাটল আমার। ফস্ করে একটা নিশ্বাস ফেললাম আমি। বুঝতে পারলাম বুড়ি মরেনি।

না মরলেও বুড়ি কিন্তু উঠল না। উঠতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি এবং ডাকাডাকির পর শুধু দু-চার সেকেণ্ডের জন্যে চোখ খুলতে পারল। পরক্ষণেই আবার চোখ বন্ধ হয়ে গেল তার।

বাবা তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে একটা ইন্‌জেকশান বার করলেন। অ্যাম্পুল ভেঙে সিরিঞ্জের মধ্যে ওষুধ ভরে প্যাঁক করে ফুটিয়ে দিলেন বুড়ির হাতে। আচ্ছন্ন অবস্থাতেই বুড়ি একটু ককিয়ে উঠল। যন্ত্রণায় সামান্য বেঁকে গেল মুখখানা। কিন্তু পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই তার চেহারায় পরিবর্তন দেখা দিল। সাড় ফিরে এল দেহে। হাত পা টান করে দিল সে। চোখ মেলল এবং আর বন্ধ করল না চোখ। তখন বাবা তাকে আবার বাংলা হিন্দি মিশিয়ে বললেন, "উঠনে সেকেগা? একটু আস্তে আস্তে উঠে বোসো তো। কই ডর্ নেই। তুম্ তো আচ্ছা হো গিয়া। পানাসি যাবে না?"

বুড়ির মুখ দেখে বোঝা গেল সে বাবার কথা বুঝতে পেরেছে। সে নিজে নিজে ওঠবার একটু চেষ্টা করতেই বাবা তাকে ধরে তুলে গুড্‌স অফিসের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে আমাদের চারপাশে বেশ ভিড় জমে গেছে। সিমেন্টের বেঞ্চির ওপর বসে থাকা ভবঘুরে লোকগুলোই প্রথম জড়ো হয়েছিল। তারপর যেহেতু পাশেই রাস্তা, ছোটখাটো একটা ভিড় জমতে দেরি হয়নি। বুড়ি উঠে না বসা পর্যন্ত ফেলারাম চুপচাপ ছিল। বুড়ি উঠে বসতেই সে ভিড়ের লোকগুলোকে ধমক দিয়ে বলল, "এখানে কী চাই সব? অ্যাঁ! তামাশা? তামাশা হচ্ছে এখানে? ভাগো।" ফেলারামের ধমকে লোকগুলো একটু এদিক-ওদিক সরে গেল, কিন্তু ভাগল না।

বুড়ি উঠে বসতে বাবা পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে আমায় বললেন, "চট করে আধ সের গরম দুধ আনতে পারিস একটা পাত্র যোগাড় করে?"

আমি টাকাটা নেব বলে হাত বাড়িয়েছি, ফেলারাম বলল, "আমায় দিন বাবু, আমি এনে দিই।"

বাবা কিন্তু ফেলারামকে দিলেন না। বরং একটু চটে গিয়ে আমায় বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা, আন।"

আমি টাকাটা নিয়ে ছুটে রাস্তায় নেমেছি, বাবা পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন, "এই ভূত! দুধ কোথায় পাওয়া যায় জানা আছে?"

আমি ফিরে এসে বললাম, "না।"

তখন ফেলারাম আবার মিনতি করে বলল, "দিন না বাবু, আমি এনে দিই।"

বাবা বললেন, "না, তোমাকে দিয়ে আমি দুধ আনাব না।"

"কেন বাবু?"

"তুমি জল ছিটিয়ে দিয়েছিল ওর গায়ে।"

ফেলারাম খুব করুণ গলায় বলল, "তখনকার কথা আলাদা বাবু। আমি কি জানতুম বুড়িটার অত অসুখ?"

বাবা দু' মিনিট কী চিন্তা করলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, "আচ্ছা যাও। একটু বেশি করে চিনি দিয়ে আনবে।"

ফেলারাম টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বাবা বললেন, "বোকার মতো গাড়িটাকে ও-মাথায় রেখে আসা বড্ড ভুল হয়ে গেছে, বুঝলি। তুই দুধটা খাওয়া বুড়িকে। আমি গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আসি। আমার ফিরতে মিনিট পনেরো লাগবে। লেভেলক্রসিং বন্ধ থাকলে আরও পাঁচ-সাত মিনিট। ততক্ষণ···।" একটু থামলেন বাবা। থেমে বললেন, "ততক্ষণ তুই বুড়ির সঙ্গে কথা বলিস একটু। পানাসি জায়গাটা কোথায়, জেলার নাম কী, কোন্ কোন্ গাড়ি যায় সেখানে, বুড়ির সঙ্গে কারা কারা ছিল, এইসব জানতে চেষ্টা করিস তো। তাহলে যাচ্ছি আমি। কী রে, তোর আবার ভয় করবে না কি?"

আমি খুব লজ্জা পেয়ে একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বললুম, "ধ্যাত্! কী যে বলো না!" বললুম বটে কিন্তু বাবা হাসতে হাসতে ওয়েটিংরুমের খোলা দরজা দিয়ে প্লাটফর্মের দিকে বেরিয়ে যেতে আমার একটু ভয়-ভয় করে উঠল। মনে হল ওয়েটিংরুমের এই লোকগুলো না থাকলে আমার সত্যি ভয় হত। লোকগুলো এখন আর আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে নেই। আগের মতো আবার সিমেন্টের বেঞ্চির ওপর বসে পড়েছে। বুড়িও বসে আছে এখনও। তবে চোখ মেলে নেই। এখন তার দু চোখ বোজা।

একটু বাদেই ফেলারাম দুধ নিয়ে ফিরল। আমি দুধ খাওয়ালাম বুড়িকে। বেশি চেষ্টা করতে হল না। একবার বলতেই চোখ খুলে এক চুমুকে দুধ খেয়ে নিল সে। কিন্তু গণ্ডগোল বাধল তারপরেই। অনেক চেষ্টা করেও বাবার বলে যাওয়া বাকি ব্যাপারগুলোর কিছু করতে পারলাম না আমি। দেখা গেল 'পানাসি' এই শব্দটা ছাড়া বুড়ি পৃথিবীর আর কিছু জানে না। আমি মনে করলাম আমার হিন্দি ভাল না, তাই হয়তো আমি ঠিকমতো বোঝাতে পারছি না বুড়িকে। বাবা পারবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবাও পারলেন না। মিনিট কুড়ির মধ্যে বাবা গাড়ি নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর বুড়িকে গাড়িতে চড়িয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ চেষ্টা করলেন বাবা। কিন্তু প্রায় কিছুই জানা গেল না। বাবার চেষ্টায় নতুন যে বস্তুটি জানা গেল, তা হল এই যে, বুড়িকে সাগরে নিয়ে এসেছে তার ছেলে। আর কাল রাত্রে বুড়ি হাওড়া 'টিসানে' তার সেই ছেলেকে হারিয়ে ফেলেছে।

তা সত্ত্বেও সে রাত্রে আমরা যে কাণ্ডটা করলাম সেরকম শুধু গল্পের বইতে পড়া যায়। বাস্তবেও যে ঘটে তা জানা ছিল না। শুধুমাত্র 'পানাসি' এই শব্দটা সম্বল করে আমরা হাওড়া স্টেশনের হাজার হাজার লোকের মাঝখান থেকে বুড়ির ছেলেকে বার করে ফেললাম। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আর সে রাত্রে বাবা একখানা গাড়িও চালিয়েছিলেন! বাবা যখন দেখলেন বুড়ির কাছ থেকে আর নতুন কোনও কথা বার করা যাবে না, মানে বুড়ি জানেই না কিছু, তখন কথাবার্তা বন্ধ রেখে একমনে গাড়ি চালাতে লাগলেন বাবা। ঝড়ের মতো ছুটল আমাদের গাড়ি। বিশ্বাস করা শক্ত যে, আমরা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বাউড়িয়া থেকে হাওড়া পৌঁছে গেলাম। বাবা পরে অবশ্য বলেছিলেন যে, রোববার ছিল বলেই সম্ভব হয়েছিল এটা। গাড়ির এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বাবা আমার সঙ্গে শুধু একটা কথা বলেছিলেন। বাকি সময় জুড়ে মনে হয় তাঁর মাথায় ঘুরছিল হাওড়া স্টেশনের চিন্তা। আমায় বলেছিলেন, "ফেলারামকে দেখে যতখানি খারাপ মনে হয়েছিল প্রথমে, আসলে লোকটা ততখানি খারাপ না, বুঝলি। আমার ট্রিটমেন্টে থাকলে দু-দিনেই ভাল করে দিতাম ওকে।"

॥ ৪ ॥

হাওড়া স্টেশনে গিয়ে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন সাড়ে-সাতটা। প্লাটফর্ম টিকিট কেটে আট আর ন' নম্বর প্লাটফর্মের মাঝখানের ঝকঝকে পিচের রাস্তাটায় গাড়ি রাখলেন বাবা। এই রাস্তাটার নাম ক্যাব রোড। স্টেশনে তখন পিক্ আওয়ার। হেভি ভিড়ভাট্টা আর হট্টগোল। লোকজন যেন উপছে পড়ছে। এদিকে ঠাণ্ডাও কম। একদম বসন্তকালের মতো লাগছে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাবা বললেন, "আধঘণ্টার মধ্যে কাজ সারতে হবে। সাড়ে-সাতটা আটটায় স্টার্ট করতে না পারলে সাড়ে-আটটায় পৌঁছতে পারব না।"

আমি বললাম, "সাড়ে-আটটাতেই পৌঁছতে হবে কেন?"

"তোর মাকে বলে এলাম সাড়ে-আটটার মধ্যে ফিরব। আর তাছাড়া···তুই কি সব ভুলে যাস নাকি? বাড়িতেও তো একখানা কাণ্ড বাধিয়ে রেখে এসেছিস। থানায় যেতে হবে না?"

"সব মনে আছে আমার।" আমি বললাম, "কিন্তু তুমি কি আধঘণ্টার মধ্যে বুড়ির ব্যবস্থা করতে পারবে?"

বাবা বললেন, "পারতেই হবে।"

আমি আর কথা বললাম না। জমজমাট স্টেশনের চারদিকে তাকিয়ে আমার মনে হল আধঘণ্টা কেন, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেও আমরা কিছু করতে পারব না। বুড়ি গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাবা খুব ব্যস্ত গলায় তাকে ডেকে তুলে নামিয়ে আনলেন। বুড়ির আচ্ছন্ন ভাব এখনও কাটেনি। হঠাৎ ঘুম ভাঙায় টলছিল সে। সেই অবস্থায় বাবা তাকে বললেন, "বুড়ি, এইটা হাওড়া স্টেশন। তোমার কিছু মনে পড়ছে? গঙ্গাসাগর থেকে কাল কখন এখানে এসে নেমেছিলে?"

বুড়ি মুখের সামনে হাতের পিঠ উলটে ধরে হাই তুলতে তুলতে বলল, "দুফারমে।"

"বাস থেকে নেমে তোমার ছেলে তোমাকে নিয়ে কোথায় বসেছিল মনে করতে পারো?"

"হাঁ, হাঁ। জরুর।" বলে বুড়ি আমাদের নিয়ে ঘুরতে আরম্ভ করল। বড্ড আস্তে আস্তে হাঁটে সে। আস্তে আস্তে হেঁটে তিন চার জায়গায় নিয়ে গেল আমাদের। প্রথমে তার জায়গাটা পছন্দ হয়, মনে হয় যেন এখানেই কাল রাত্রে ছেলের সঙ্গে সে বসেছিল। কিন্তু বাবা যেই বলে ওঠেন, "কী বুড়ি, এই জায়গাটা?" অমনি অপছন্দ হয়ে যায় তার। বলে, "নেহি মালেক। এ নেই। দুসরি কাঁহি হোগা।" আসলে ঠিকমতো জায়গাটা সে চিনে উঠতে পারছিল না। বুড়িকে দোষ দেওয়া যায় না। সে জীবনে একবারই এখানে এসেছে। আমি কতবার এলাম, আমারই ভুল হয়ে যায়। মাসখানেক আগেও আমি মায়ের সঙ্গে ট্রেনে চেপে এসেছিলাম। মা নিউ মার্কেটে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় মা যেই বললেন, "যা তো ছুটে

গিয়ে দুখানা আন্দুলের টিকিট নিয়ে আয় তো। ব্যস্! আমি তো আর খুঁজে পাই না বুকিং অফিস। অথচ কতবার তার আগে মায়ের সঙ্গে সাউথ ইস্টার্নের বুকিং অফিসে গেছি।

বুড়ির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে দেখা গেল স্টেশনের মাঝামাঝি এক জায়গায় তখনও বোঁচকাবুচকি নিয়ে হাজারখানেক সাগরযাত্রী বসে আছে। বাবা সেখানে বুড়িকে হঠাৎ দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই লোকগুলোও তোমার মতো সাগরে গিয়েছিল। দ্যাখো তো, এর মধ্যে কাউকে তুমি চেনো নাকি?"

বুড়ি চোখ পিটপিট করে দেখে নিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "নেই মালেক।"

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, তার পাশে একটু দূরে একটা অবাঙালি ফলঅলা নারকোলিকুল বিক্রি করছিল। বাবা ঝপ করে তার পাশে গিয়ে বসে পড়ে বললেন, "এই ভাই, তুমি পানাসি বলে কোনও জায়গার নাম শুনেছ? এই বুড়িটা সাগরে চান করতে এসে হারিয়ে গেছে। পানাসি ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছে না। জানা আছে তোমার কিছু?" হাওড়া স্টেশনের ফলঅলারা সবাই বাংলা জানে। বাবা তাই ওর সঙ্গে বাংলাতে কথা বললেন।

ফলঅলাটা মন দিয়ে শুনল বাবার কথা। তারপর বুড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিঁউ রে! পানাসি যায়গি?"

বুড়ি মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে জানাল সে যাবে। ফলঅলা জিজ্ঞেস করল, "পানাসি কোন জিলা পড়তা রে?"

বুড়ি কথা বলার আগেই বাবা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ওসব আমরা জিজ্ঞেস করেছি। ও কিছু জানে না। আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছিলাম, তুমি কি নামটা শুনেছ কখনও?"

ফলঅলা বলল, "না বাবু, আমার ঘর আছে আরা জিলা। পানাসি নাম তো আমি কখনও শুনেনি।"

বাবা বিরক্ত হয়ে আমাদের বললেন, "আয় আয়। চলে আয়।" পরে ভিড় ঠেলে খানিকটা এগিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় আমাদের দাঁড় করিয়ে বাবা বললেন, "এইখানে বুড়িকে নিয়ে দাঁড়া একটু। আমি চট করে একবার ইনকোয়ারি থেকে ঘুরে আসি। পানাসি কোনও স্টেশনের নাম হলে ওরা ঠিক জানবে।" বাবা দ্রুত হেঁটে অল্প দূরের একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। প্রকাণ্ড ঘর। আমি দেখলাম সেই ঘরের মাথায় নীল রঙের নিয়ন আলোয় ইংরেজিতে লেখা আছে ইনকোয়ারি। ঠিক সেই ঘরখানার পাশ দিয়েই একখানা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল আমাদের। বুড়ি অবশ্য দাঁড়িয়ে থাকল না। প্রথমে তার দুটো হাঁটু হাত দিয়ে চেপে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সামান্য কোঁকাল সে। তারপর সেই ভাবেই আস্তে আস্তে উবু হয়ে বসল। এবং সকলের শেষে থেবড়ে সিমেন্টের ওপর। বাবা ফিরে এসে বললেন, "উঃ! এই স্টেশনটায় যা ভিড়! ইচ্ছেমতন একটা কাজও করবার উপায় নেই। দু' মিনিটের কাজ দশ মিনিট লেগে যায়।"

"পানাসির কথা কী বলল বাবা?"

"হোপলেস! পানাসি বলে কোনও স্টেশন নেই।"

"তা হলে এখন কী করবে?"

বাবা উত্তর দিলেন না। হাওড়া স্টেশনের বিশাল জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। বাবার মুখ দেখে আমার মায়া হচ্ছিল খুব। ক্রমশ যেন কীরকম হতাশ হয়ে পড়ছেন বাবা। আধ ঘণ্টার মধ্যে সব কাজ সেরে চলে যেতে চেয়েছিলেন। স্টেশনের বড় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম বাবার দেওয়া আধ ঘণ্টার পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। অথচ এখনও পর্যন্ত আমরা এক-পাও এগুতে পারিনি। যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। বাবাও মনে হয় ঘড়ির দিকে লক্ষ রাখছিলেন। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "না রে সন্দীপ, পারা গেল না। বুড়িকে বোধহয় শেষ পর্যন্ত জি আর পি-র হাতেই তুলে দিতে হবে।"

"জি আর পি-র হাতে তুলে দেবে?" আমি অবাক। জি আর পি মানে রেলের পুলিশ। আমার কান্না পেয়ে গেল। সন্ধে থেকে এত কাণ্ড করেও যদি আমরা বুড়িকে পানাসি না পাঠাতে পারি, তার চেয়ে কষ্টের কী আছে। তা ছাড়া বুড়িকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে কী লাভ? তারা কি বুড়িকে পানাসি

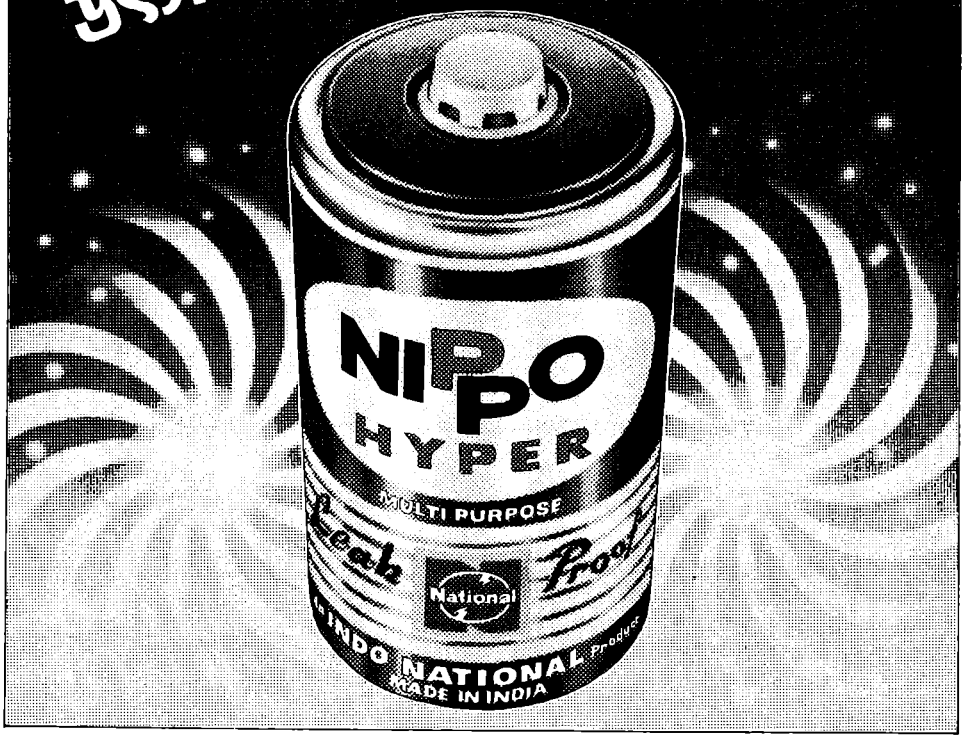

চারিদিকে আনন্দ উৎসব উজ্জ্বল পরিবেশ। ডবল শক্তিশালী নিপ্পো ব্যাটারি লাগান আর পরিবারের সকলের সাথে মিলেমিশে আনন্দে উচ্ছল হোন। টু-ইন-ওয়ান আর খেলনার জন্য নিপ্পো হাই টপ সুপার, ট্রানজিস্টর, টেপ রেকর্ডার আর ক্যালকুলেটরের জন্য নিপ্পো হাইপার আর টর্চের জন্য নিপ্পো স্পেশাল।

National
নিপ্পো ব্যাটারি

everest/d85/INL/217 Ben

পাঠাবে ? তাদের বয়ে গেছে। তাদের কাজ তো চোর-ডাকাত ধরা। এই সব কথা আমি নিজে মনে মনে ভাবলাম। বাবাকে জানালাম না। আমার মনে হল বাবাকে এসব কথা জানালে বাবার কষ্ট হবে। কষ্ট অবশ্য বাবার হচ্ছিলই। চুপচাপ ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবা। নিরুপায় হয়ে আমিও দাঁড়িয়ে রইলাম। বুড়ি বসে বসে ঢুলছে। তার দায়িত্ব আমরা নিয়ে নেওয়ায় সে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। অনবরত ট্রেন ছাড়বার ঘোষণা হচ্ছে মাইকে। মাঝে-মাঝে গানও বাজছে। কখনও-সখনও তারের বাজনা। আমার মনে হল এত ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে বুড়ির পানাসি যাবার ট্রেনও থাকতে পারে। বুড়ির ছেলে হয়তো কাল রাত থেকে আজ সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। তারপর এইমাত্র হয়তো কোনও একটা ট্রেন ছেড়েছে, তাতে চেপে সে পানাসির দিকে ছুটে চলেছে। ধরে নিয়েছে তার মা চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল। কথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে ভীষণ জোরে ঢিপঢিপ করে উঠল আমার।

ঠিক এই সময়ে বাবা খুব জোরে হঠাৎ একটা তুড়ি বাজিয়ে বলে উঠলেন, "পেয়েছি সন্দীপ। ইউরেকা ! পেয়ে গেছি, একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে মাথায়।"

শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠে বললুম, "কী, কী আইডিয়া বাবা ?"

"পরে শুনবি। তার আগে আমি বুড়ির সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। এই বুড়ি, তোমার নাম কী। কেয়া নাম হ্যায় ?"

বুড়ি বসে বসে ঢুলছিল। চোখ তুলে বাবার দিকে একবার তাকাল সে। তারপর চোখ নামিয়ে ভীষণ লজ্জার সঙ্গে বলল, "মেরা নাম ? মেরা নাম রেশমি।"

"তোরা এখানেই থাক সন্দীপ। আমি আসছি।" বলেই বাবা আবার বললেন, "না না, এখানে না। বুড়িকে ওঠা। বুড়িকে উঠিয়ে আয় আমার সঙ্গে।" বাবা এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, আমি এগিয়ে বুড়িকে তুলব, তার তর সইল না বাবার। বুড়িকে হাত ধরে টেনে নিজেই তুললেন। তারপর ক্যাব রোড পেরিয়ে আমাদের নিয়ে এসে দাঁড় করালেন বড় ঘড়ির নীচে এবং পরমুহূর্তে হাওড়া স্টেশনের ভীষণ ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ফিরে এলেন প্রায় দশ মিনিট বাদে। এই দশ মিনিট যে কী ভয়ানক উদ্বেগের মধ্যে কাটল আমার সে শুধু আমিই জানি। ফিরে আসতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বাবা, পেয়ে গেছ বুড়ির ছেলেকে ?"

বাবা বললেন, "না। পাইনি এখনও। তবে পেয়ে যাব। এইবার ঠিক····।" বাবা তাঁর কথাটা পুরো শেষ করতেও পারলেন না। তার আগেই হাওড়া স্টেশনের মাইক আচমকা গান থামিয়ে বলে উঠল, "একটি ঘোষণা। এইমাত্র সাগরযাত্রী এক বুড়িকে পাওয়া গেছে। নাম রেশমি। সম্ভবত কাল সন্ধেবেলা সাগর থেকে ফিরে সে হারিয়ে যায়। বুড়ি পানাসি যাবে। যদি তার গ্রামের কোনও লোক কিংবা কোনও আত্মীয় এখন স্টেশনে থাকে, সে যেন বড় ঘড়ির নীচে চলে আসে। বুড়ি বড় ঘড়ির নীচে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।"

ঘোষণাটা হিন্দিতে করা হল। তিনবার। আর প্রত্যেকবার কান খাড়া করে শুনলাম আমি। শুনতে শুনতে শেষ বাক্যটা মুখস্থ হয়ে গেল আমার। "আগর উসকি গাঁওকা কোই আদমি কি রিস্তেদার টিশান পর ইসবকত রহে তো উনকো আভি

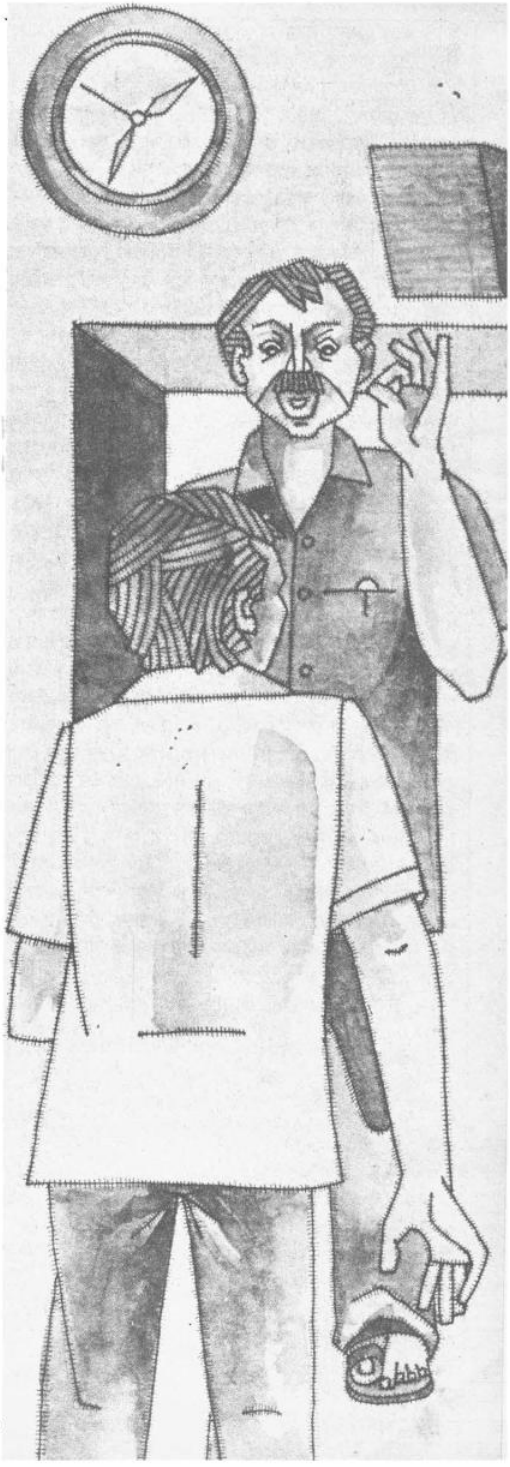

আভি বড়া ঘড়িকা নীচে আনেকে লিয়ে অনরোধ কিয়া যাতা হ্যায়। অনরোধ কিয়া যাতা হ্যায়।" শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। আমি জানি হাওড়া স্টেশনের দূরতম প্রান্তেও ঘোষণাটি ছড়িয়ে পড়েছে। যে যেখানে আছে শুনতে পেয়েছে। যে চা খাচ্ছে, যে এই মাত্র স্টেশনে ঢুকল, গাড়িতে বসে আছে যে কিংবা গাড়ি ধরবার জন্যে ছুটছে, সবাই জেনে গেছে বুড়ির কথা। বুড়ির ছেলে যদি এখনও হাওড়া স্টেশনে থাকে···। আমি আর ভাবতে পারলুম না। উত্তেজনায় বুকটা যেন ফেটে যাবার মতো হল আমার। আমি শক্ত করে বাবার একখানা হাত চেপে ধরলাম। বাবা তাঁর অন্য হাতটা আমার কাঁধে রেখে বললেন, "কী রে! এইবার হবে তো?"

আমি উত্তর দেবার সময় পেলাম না। তার আগেই দেখলাম একটা আধবুড়ো লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটা পরে আছে একটা ময়লা ধুতি আর ময়লা ফতুয়া। মুখভর্তি কাঁচা পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। আমি ভাবতে পারিনি যে, এই আধবুড়ো লোকটা বুড়ির ছেলে। আমার ধারণা ছিল বুড়ির ছেলে হবে আমার মতো কিংবা আমার চেয়ে একটু বড়। কিন্তু এখন বুড়িকে টলতে টলতে এবং বিড়বিড় করতে করতে লোকটার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তারপর সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। সেই আধবুড়ো লোকটার মাথা বুকে চেপে ধরে বুড়ির কী কান্না। বুড়িও কাঁদে, তার ছেলেও কাঁদে। আর 'আইরে মাইরে' করে অনর্গল দেশোয়ালি হিন্দি। তার একবর্ণও বুঝতে পারলাম না আমি। বাবা পারলেন কি না জানি না। আমি পারলাম না। আমাদের চারপাশে লোক জড়ো হয়ে গেল। অধিকাংশই সাগর থেকে ফেরা লোক। তারা কেউ বাবার কাছ থেকে, কেউ আমার কাছ থেকে সব শুনে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। বুড়ি তার বুড়ো ছেলেকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে বাবার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, "গোড় পড় মালিক কো।" আমাকে দেখিয়ে বলল, "ইয়ে হ্যায় মালিককা বেটা। ইসকাভি গোড় পড়।" আর লোকটা অমনি একবার বাবার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে, একবার আমার। সে একটা দৃশ্য। আমরা কেউ তাকে প্রণাম করতে দেব না, তার হাত ধরে আটকাব, আর সে প্রণাম করবেই। আর বুড়িটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্রমাগত বলতে লাগল, "কেন তোমরা ওকে গোড় পড়তে দিচ্ছ না। ছেলেটা বহুত বেওকুফ। না হলে নিজের মাকে খোয়ায়? বহুত্ বহুত্ বেওকুফ।"

বাবা বুড়ির ছেলের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন কাল রাত্রে যখন তারা গাড়ি ধরতে যাচ্ছে, তখন হারিয়ে যায় বুড়ি। এত ভিড় ছিল যে মাকে সে ঠিকমতো আগলে রাখতে পারেনি। সে ঠিক গাড়িতেই উঠেছিল কিন্তু তার মা উঠে পড়েছিল ভুল গাড়িতে। সে আরও জানাল তাদের গাড়ি ছাড়বে রাত দশটায়। গোরখপুর এক্সপ্রেস। পানাসি গোরখপুর জেলার একটা গ্রামের নাম। গোরখপুর স্টেশনে নেমে প্রায় তিরিশ মাইলের মতো বাসে যেতে হয়।

বাবা ভীষণ খুশি। বাবার মুখ দেখেই বোঝা গেল সে কথা। কিন্তু আমার আনন্দ বর্ণনা করতে পারব না। একটা কাজ, যে কাজের পেছনে অনেক পরিশ্রম এবং দুশ্চিন্তা থাকে, সেই কাজটা সফল হলে যেরকম আনন্দ হয়, আমার আনন্দ ঠিক সেই রকম। আমার পাশ দিয়ে অনবরত লোকজন ছুটে চলে যাচ্ছিল। তারা গাড়ি ধরবে। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল একটা খুব উঁচু জায়গায় উঠে এই লোকগুলোকে ডেকে চেঁচিয়ে বলি, "এই যে বুড়িটাকে দেখছেন, এর কথাই একটু আগে মাইকে ঘোষণা করে বলা হল। আপনারা শুনেছেন নিশ্চয়ই। আর এই হল ওর ছেলে। বুড়িটা হারিয়ে গিয়েছিল। আমরা এই বুড়িটাকে উদ্ধার করে এনে তার ছেলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছি। আমরা মানে আমি আর আমার বাবা।"

এই সব তো আর করা যায় না, তাই আমিও করলাম না। শুধু মনে মনে ভাবলাম। আর ভাবতে ভারী আনন্দ হল। শেষে বাবাকে ঠেলা দিয়ে বললাম, "বাড়ি যেতে হবে না? চলো এবার। আটটা দশ হয়ে গেল যে।"

বাবা চমকে উঠে বললেন, "তাই তো! সাড়ে আটটায় পৌঁছুব কী করে? চল চল।" বলেও বাবা কিন্তু গেলেন না। বুড়ির দিকে ফিরে বললেন, "এই বুড়ি, তোমার ছেলেকে নিয়ে আমার সঙ্গে একটু এসো তো।" আমাকে বললেন, "ওদের দুটো ভাত খাইয়ে দিই, কী বলিস।"

বুড়ি আর তার ছেলেকে ভাত খেতে বসিয়ে দিয়ে আমরা যখন হাওড়া স্টেশনের "ভেজিটেরিয়ান" লেখা ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলুম তখন ঘড়িতে আটটা কুড়ি। কুড়ি মিনিট লেট। বেরিয়ে স্টেশনটাকে আমার হঠাৎ ভারী ক্লান্ত মনে হল। লোকজন, হট্টগোল, ছোটাছুটি, সবই ঠিক আছে, কিন্তু যখন এসে নেমেছিলাম, তখনকার মতো ব্যস্ততা আর উত্তেজনা কোথাও নেই। একটু যেন শীত-শীতও করল। আমাদের গাড়ি প্লাটফর্মের ভেতরের ক্যাব রোডে। তাই গেট দিয়ে প্লাটফর্মের মধ্যে ঢুকতে হল আমাদের। আর ঢুকেই চমকে উঠলুম। সন্তুর কাকাবাবুর মতন দেখতে পুরী প্যাসেঞ্জারের সেই খোঁড়া ভদ্রলোক হাওড়া স্টেশনের শেষ প্লাটফর্মের দিক থেকে ক্রাচ বগলে এগিয়ে আসছেন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাবার হাত টেনে ধরে বললাম, "বাবা! সন্তুর কাকাবাবু!"

"কই?"

আমি হাত তুলে দেখালাম। বাবা অমনি সোজা ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তা আটকে হাত জোড় করে বললেন, "নমস্কার।"

"নমস্কার।" বলে ভদ্রলোক প্রথমে আমায় দেখলেন। তারপর বাবার দিকে ফিরে বললেন, "ডাক্তার হরিহর মান্না?"

"হ্যাঁ," বাবা মাথা নাড়ল, "আপনি?"

"আমাকে সন্দীপ চেনে।" এক মুহূর্ত থামলেন উনি। থেমে বললেন, "বুড়িকে তার ছেলের হাতে তুলে দিলেন তাহলে?"

বাবা ভীষণ অবাক হয়ে বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু সেকথা আপনি জানলেন কী করে?"

"যেমন করে হাওড়া স্টেশনের সব লোক জানল। মাইক, পানাসি কথাটাও মনে ছিল আমার।" উনি হঠাৎ আমার দিকে ফিরলেন। "প্যাকেটটা কী করলে সন্দীপ?"

"কোন্ প্যাকেট?" একেবারে বোকার মতো জিজ্ঞেস করে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য জিভ কাটলাম। কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে। আসলে আন্দুলে গাড়ি থেকে নামবার চার

ঘণ্টা পর ভদ্রলোককে আবার হঠাৎ এভাবে হাওড়া স্টেশনে দেখে মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিলাম সব কিছু।

ওঁর গলা কঠিন হয়ে উঠল। উনি ভুরু কুঁচকে বললেন, "তোমার ব্যাগে কোনও প্যাকেট ছিল না?"

বাবা বাঁচিয়ে দিলেন। বললেন, "মাফ করবেন। ছিল। বাঙ্কের লোকটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওর ব্যাগের মধ্যে। পুলিশ গাড়িতে উঠতেই····।"

উনি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, আমি জানি।"

"আপনি তো জানবেনই," বাবা হেসে ফেললেন। "কিন্তু লোকটা কে?"

উনি বললেন, "আমার চেনা কেউ না। আমি প্রথম দেখি বালেশ্বরে গাড়িতে উঠে। আমাদের উঠতে দেখেই প্যাকেটটা তাড়াতাড়ি পেট-কাপড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। এমন ভাবে নিয়েছিল যে তখনই আমার সন্দেহ হয়। তারপর সারাদিনে একবারও বাঙ্ক থেকে নামতে না দেখে আমি ডেফিনিটলি বুঝতে পারি যে প্যাকেটটার মধ্যে ভয়ানক কিছু আছে।" একটু থামলেন উনি। থেমে বললেন, "আমি ভেবেছিলাম হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ঢুকলে যা করার করব। কিন্তু তক্ষুনি মনে হয়েছিল স্মাগলাররা কোনও বড় স্টেশন তেমন পছন্দ করে না। লোকটা যদি শেষ পর্যন্ত হাওড়া না যায় ভেবে আমি মেচেদায় নেমে উলুবেড়ে জি আর পি-কে ফোন করে দিলাম। তারাও এসে নামিয়ে নিয়ে গেল ওকে। কিন্তু নিয়ে যাবার সময় প্যাকেটটা দেখতে পেলাম না ওর সঙ্গে। ও যে পুলিশ দেখে সন্দীপের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে একদম ধরতে পারিনি। হঠাৎ খেয়াল হল সন্দীপ আন্দুলে নেমে পড়তে। মনে হল নিশ্চয়ই ওই ব্যাগের মধ্যে রেখেছে। না হলে যাবে কোথায় প্যাকেটটা?"

"আপনার অনুমান সেন্ট পারসেন্ট কারেক্ট। বুড়ি সম্পর্কে আপনি যা যা বলেছিলেন তাও মিলে গেছে।"

বাবার প্রশংসা উনি ঠোঁটের কোণ দিয়ে সামান্য হেসে গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন, "প্যাকেটটা খুলেছিলেন আপনারা? না তারও সময় পাননি? তার আগেই···।"

বাবা বললেন, "না, খুলেছিলাম।"

উনি খুব ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী আছে ভেতরে?"

"একটা সোনার গণেশ-মূর্তি। ওজন প্রায় আধ সেরের মতন।"

"তা হলে তো লোকটা স্মাগলার নয়। কোনও বড়লোকের বাড়ির চাকরবাকর হবে মনে হচ্ছে। রাজবাড়িরও হতে পারে। উড়িষ্যায় অনেক এস্টেট আছে। যাকগে, সে পুলিশ যা হয় করবে।" বলে হাসলেন উনি। হেসে বললেন, "আপনারা একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যান। আপনার বাড়িতেও হয়তো পুলিশ এসে বসে আছে।"

বাবা অবাক হয়ে বললেন, "কেন? আমাদের বাড়িতে পুলিশ এসে বসে থাকবে কেন?

"না, না। অন্য কিছু না। ওই প্যাকেটটার জন্যে। আমি সাঁতরাগাছি থেকে সাঁকরাইল থানায় ফোন করে দিয়েছিলাম।"

বাবা বললেন, "সে ভালই করেছেন। এই পরিশ্রম করে গিয়ে রাত দুপুরে আমাকে আর থানায় ছুটতে হবে না। আপনি বালেশ্বরে কোথায় গিয়েছিলেন?"

"চাঁদিপুর। তবে সন্দীপের মতো সমুদ্র দেখতে নয়। ওইখানে সমুদ্রতীরে একটা ডিফেন্স ফ্যাক্টরি আছে। আমার কাজ ছিল সেই ফ্যাক্টরিতে।"

"আর একটা কথা। আন্দুল থেকে পুরী প্যাসেঞ্জার ছেড়েছিল সাড়ে-চারটের সময়। আর এখন রাত সাড়ে-আটটা। এই চারঘণ্টা আপনি কোথায় ছিলেন? হাওড়া স্টেশনে?"

"না, হাওড়া স্টেশনে থাকতে যাব কেন? গাড়িতেই ছিলাম। এই তো খানিকটা আগে পুরী প্যাসেঞ্জার হাওড়া স্টেশনে ঢুকল।"

"চার ঘণ্টা লাগল আন্দুল থেকে আসতে?"

"হ্যাঁ, তার মধ্যে তিন ঘণ্টা সাঁতরাগাছিতে দাঁড়িয়েছিল।"

বাবা অবাক হয়ে বললেন, "তবু আপনি গাড়ি পালটাননি?"

উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে হেসে বললেন, "সন্দীপের মতো আমিও ঠিক করেছিলাম যত রাত হোক এই গাড়িতেই যাব। গাড়ি যখন চোদ্দ নম্বর প্লাটফর্মে ঢুকল তখন গাড়িতে শুধু একজন প্যাসেঞ্জার। আমি। আর একটা লোকও নেই।"

একটু বাদে মার্ক ফোরে উঠে বাবা একটা সিগারেট ধরালেন। সেই বিদেশী সিগারেট। গাড়ি স্টার্ট করতে করতে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "তোর কাকাবাবু তো বড্ড জেদি লোক। চারঘণ্টা চুপচাপ বসে রইল। তবু····।"

আমি বাধা দিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, "কাকাবাবু আমার নয়। সন্তুর।"

"ওই একই হল।"

না। এক হল না। তা ছাড়া উনি যে সন্তুর কাকাবাবু তারও কিন্তু কোনও প্রমাণ পাইনি আমরা। উনি মোটেই ওঁর নাম বলেননি।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক (আপাতত তার নাম পঞ্চানন্দ) জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা উদ্ভট-বিজ্ঞানী শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি তাঁর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে গজ-পালোয়ানের কাছে। আর এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে এক মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন। সন্দিগ্ধ দুই ভাই পালিয়ে যে বাসে ওঠে, তাতে খুন হয় মহারাজার সেক্রেটারি। গজ'র ডেরা চক-সাহেবের পোড়োবাড়িতে। সেখানে ঢুকে যে-লোক মারা যায়, তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। মধ্যরাতে তিন ছায়ামূর্তি শিবুবাবুর ল্যাবরেটরির দিকে এগোয়। পঞ্চানন্দ ন্যাড়াকে বলে, গজকে তারা ধরে নিয়ে গেছে। সে হরিবাবুর কবিতা শোনে, বাজার করে। চক-সাহেবের বাড়িতে শোনে রহস্যময় শব্দ। উঁকি মেরে যাকে দেখতে পায়, তার ক্ষমতা সীমাহীন। হরিবাবু ছাতে উঠে নীল চাঁদ দেখে কবিতা লেখেন। পঞ্চানন্দ বলে, সেটা উড়ন্ত-চাকি। নিঃশব্দে সে চক্-সাহেবের বাড়ির দিকে এগোয়। তারপর ···

কোথায় বস্তুটা নেমেছে সে সম্পর্কে পঞ্চানন্দর একটা আন্দাজ ছিল মাত্র। তবে নামবার মুহূর্তে আলো নিবিয়ে দেওয়ায় সঠিক নিশানা সে ধরতে পারেনি। তবে চক-সাহেবের বাড়ির দিকটাই হবে। পঞ্চানন্দ খুব দৌড়-পায়ে হেঁটে যখন চক-সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছল তখন তার সবটুকু মনোযোগ সামনের দিকে। ফলে পিছন দিক থেকে যে বিপদটা আসছিল, সেটা সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না তার। রাস্তা থেকে চক-সাহেবের বাড়ির দিকে যাওয়ার একটা পরিত্যক্ত ভাঙা রাস্তা আছে। দু'ধারে মস্ত মস্ত বাবলাগাছ, কাঁটা-ঝোপ, ঘাস-জঙ্গল। সেই রাস্তার মোড়ে একজন অতিকায় ঢ্যাঙা লোক একটা ঝোপের আবডালে দাঁড়িয়ে হাতে একটা ক্যামেরার মতো বস্তুতে কী যেন দেখছিল, পঞ্চানন্দ যতই নিঃসাড়ে আসুক লোকটা ঠিকই টের পেল তার আগমন। টপ করে অন্ধকারে আরও একটু সরে দাঁড়াল সে। পঞ্চানন্দ যখনই ভাঙা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল, তখনই বেড়ালের মতো তার পিছু নিল ঢ্যাঙা লোকটা।

চক-সাহেবের বাড়ির পিছনে প্রকাণ্ড মাঠ। খানাখন্দে ভরা, পুরনো মজা পুকুর, ঝোপঝাড়, জলা জমির এই মাঠে লোকজন বড় একটা আসে না। চাষবাসও নেই। মাঝেমধ্যে গোরু চরাতে রাখাল-ছেলেরা আসে মাত্র। সন্ধের পর এখানে আলেয়া দেখা যায়।

পঞ্চানন্দ চক-সাহেবের বাড়ি পিছনে ফেলে দ্রুত পায়ে মাঠটার দিকে হাঁটছিল। হঠাৎ কেন যেন তার মনে হল, সে একা নয়। মনে হতেই সে পিছু ফিরে চাইল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। সন্তর্পণে টর্চটা একবার জ্বালল সে। পরমুহূর্তেই নিবিয়ে দিল।

ঢ্যাঙা লোকটা তার চেয়ে কম সেয়ানা নয়। একটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে সে যন্ত্রের ভিতর দিয়ে লক্ষ রাখছিল পঞ্চানন্দকে। পঞ্চানন্দ টর্চ জ্বালবার আগেই একটা গাছের আড়ালে সরে গেল সে।

পঞ্চানন্দ একটু দ্বিধাগ্রস্ত হল। সে জানে যে-সব অজানা মানুষ বা অমানুষের সঙ্গে তাকে পাল্লা দিতে হচ্ছে, তারা খুবই তুখোড় এবং শক্তিমান। চক-সাহেবের বাড়িতে যে-লোকটি স্যাঙাত নিয়ে থানা গেড়েছে সে বড় যে-সে লোক নয়। পঞ্চানন্দকে ইচ্ছে করলে বায়ুভূত করে দিতে পারে যে কোনও সময়ে।

সুতরাং পঞ্চানন্দ একটু সাবধান হল। খোলা জায়গা এড়িয়ে ঝোপঝাড় খুঁজে আড়াল হয়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল।

সামনে অন্ধকার বিশাল মাঠ। কিছুই দেখা যায় না। কুয়াশায় সব কিছু এক ঘেরাটোপে ঢাকা। খুব আবছা এক ধরনের আভাস মাত্র পাওয়া যাচ্ছে।

দপ করে আলেয়ার একটা নীল শিখা জ্বলে উঠে বাতাসে খানিক দোল খেয়ে নিবে গেল। ফের একটু দূরে আর একটা জ্বলে উঠল।

আলেয়া দেখে পঞ্চানন্দ আন্দাজ করল যে, ওদিকটায় জলা। সাধারণত জলা-জমিতেই আলেয়া দেখা যায়।

পঞ্চানন্দ আর এগোল না। একটা বড়সড় ঝোপ দেখতে পেয়ে আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে খুব তীক্ষ্ণ নজরে জলাটা দেখতে লাগল। গগন-চাকি যদি এখানে নেমে থাকে তবে জলার আশপাশেই নেমেছে।

কিন্তু অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেও কিছুই ঠাহর করতে পারল না সে। তবে সে ধৈর্যশীল মানুষ। চুপচাপ বসে চোখকে যতদূর তীক্ষ্ণ করা যায় করে চেয়ে রইল।

খুব ক্ষীণ একটা আলো দেখা গেল কি ? বাঁ ধারে ওই যেখানে খুব তুঁতেগাছ জন্মায়। হ্যাঁ, ওই দিকটায় একটা যেন নীলচে মতো আলো ফুটে উঠছে।

একটু ঝুঁকে সামনের ঝোপটা হাত দিয়ে সরিয়ে পঞ্চানন্দ দেখার চেষ্টা করল।

একেবারে নিঃশব্দে লম্বা ঢ্যাঙা একটা ছায়া এগিয়ে এল পিছন দিক থেকে। পঞ্চানন্দ টেরও পেল না। ঢ্যাঙা লোকটার হাতে টর্চের মতো একটা বস্তু। কিন্তু সেটা টর্চ নয়। লোকটা যন্ত্রটা তুলে একটা সুইচ টিপল।

কিছু টের পাওয়ার আগেই পঞ্চানন্দ লটকে পড়ল মাটিতে। অবশ্য ঝোপঝাড়ের জন্য পুরোটা মাটিতে পড়ল না সে। লটকে রইল মাঝপথে।

ঢ্যাঙা লোকটা যেন একটু দুঃখিতভাবেই চেয়ে রইল পঞ্চানন্দের নিথর দেহটার দিকে। তারপর দূরবিনের মতো যন্ত্রটা তুলে একটা বোতাম টিপল।

যন্ত্রের ভিতরে একটি কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল, "সব ঠিক আছে ?"

ঢ্যাঙা লোকটা মৃদু স্বরে বলল, "একজন লোক এদিকে

এসেছিল। মনে হয় মজা দেখতে। তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।"

"লোকটার শরীর ভাল করে সার্চ করে দ্যাখো। টিকটিকিও হতে পারে।"

"দেখছি।"

ঢ্যাঙা লোকটা খুব দ্রুত এবং দক্ষ হাতে পঞ্চানন্দর পকেট ট্যাঁক হাতড়ে দেখে নিল। তেমন সন্দেহজনক কিছু পেল না।

যন্ত্রের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "কিছু নেই।"

"জলার দিকে লক্ষ রেখেছ?"

"হ্যাঁ। এখনও মুভমেন্ট কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে এটা একটা অ্যাডভান্স সার্চ পার্টি। প্রাথমিক খোঁজখবর নিতে নেমেছে।"

"লক্ষ রাখো। বেশি কাছে যেও না। আমার ধারণা যন্ত্রটার মধ্যে কোনও জীব নেই। শুধু যন্ত্রপাতি আর যন্ত্রমানব আছে। জীব থাকলে আমার স্ক্যানারে ধরা পড়ত।"

"আমি লক্ষ রাখছি।"

"আকাশে যন্ত্রটাকে আরও কেউ-কেউ দেখে থাকতে পারে। যদি দেখে থাকে তবে তারাও হয়তো এদিকে আসবে। নজর রেখো। কাউকেই জলার দিকে তুঁতেবনে যেতে দিও না।"

"আচ্ছা।"

ঢ্যাঙা লোকটা সুইচ টিপে হাতের যন্ত্রটাকে অন্য কাজে নিয়োগ করল। চার দিকের নিকটবর্তী আবহমণ্ডলে কোনও মানুষ ঢুকলেই যন্ত্র তাকে খবর দেবে।

ঢ্যাঙা লোকটা বিরক্ত হয়ে দেখল, যন্ত্রটা সঙ্কেত দিচ্ছে। অর্থাৎ অন্য কোনও মানুষ কাছাকাছি এসেছে। ঢ্যাঙা লোকটা একটু আড়ালে সরে গেল এবং চোখে দূরবিনের মতো আর একটা যন্ত্র লাগিয়ে অন্ধকারেও চারদিকটা দেখতে লাগল।

নিশুত রাত্রে তিনটে ছায়ামূর্তি জলার দিকে এগিয়ে আসছিল। তিনজনেরই হোঁতকা চেহারা। একটু দুলে দুলে তারা হাঁটে। তবে চেহারা দশাসই হলেও তারা হাঁটে বেশ চটপটে পায়ে। তেমন কোনও শব্দও হয় না।

জলার দক্ষিণ দিকে মাইল-তিনেক দূরে একটা মস্ত ঢিবি আছে। ঢিবির চারদিকে বহুদূর অবধি জনবসতি নেই। অত্যন্ত কাঁকুরে জমি, ঘাস অবধি হয় না। তারই মাঝখানে ওই ঢিবি। লোকে বলে ঢিবির মধ্যে পুরনো রাজপ্রাসাদ আছে। যেটা নেহাতই কিংবদন্তী।

তবে ওই ঢিবির গায়ে বেশ বড়সড় কয়েকটা গর্ত হয়েছে ইদানীং। রাখাল-ছেলেদের মধ্যে কেউ-কেউ সেইসব গর্ত লক্ষ করেছে বটে, কিন্তু তারা কেউ সে-কথা আর পাঁচজনকে বলার সুযোগ পায়নি। কারণ যারাই ঢিবিটার কাছেপিঠে গেছে, তাদেরই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কয়েক ঘন্টা পর কোনও গাঁয়ের ধারে পাওয়া গেছে। জ্ঞান ফিরে আসার পরও তারা আর স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি ফিরে পায়নি। আবোলতাবোল বকে.আর বিড়বিড় করে। সুতরাং ঢিবির গায়ে গর্তের কথা কেউ জানতে পারেনি।

সেই ঢিবি থেকেই একটি গর্তের মুখ দিয়ে তিনটে ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসেছে। খুব নিশ্চিন্তে জলার দিকে হাঁটছে তারা। নিচু এক ধরনের গোঙানির স্বরে তারা মাঝে-মাঝে সংক্ষিপ্ত

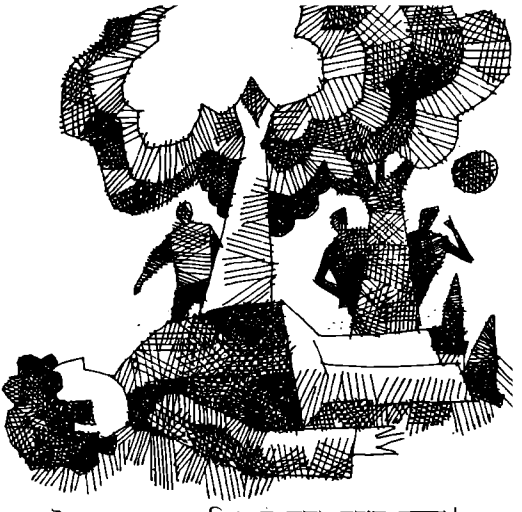

দু-একটা কথাও বলছে। কিন্তু সে ভাষা বোঝার ক্ষমতা কোনও মানুষের নেই।

জলার কাছ-বরাবর এসে তিনজন একটু দাঁড়াল। একজন একটা ছোট্ট পিরিচের মতো জিনিস বের করে সেটার দিকে চাইল। অন্য দু'জন একটু মাথা নাড়ল। পিরিচের মধ্যে তারা কী দেখল কে জানে, তবে তিনজনেই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল।

ঢ্যাঙা লোকটা তার দূরবিনের ভিতর দিয়ে অন্ধকারে তিনজনকে স্পষ্ট দেখতে পেল। তাদের হাতের পিরিচটাও লক্ষ করল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে টর্চের মতো যন্ত্রটাকে তুলে পর পর কয়েকবার সুইচ টিপল।

তিনজন অতিকায় জীব হঠাৎ থমকে দাঁড়াল জলার ওপাশে। তিনজনই একটু কেঁপে উঠল। কিন্তু পঞ্চানন্দের মতো তারা লটকে পড়ল না।

হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল তিনজন একসঙ্গে। তারপর চিতাবাঘের মতো চকিত পায়ে তারা এক লহমায় জলাটা পার হয়ে দৌড়ে এল এদিকে।

ঢ্যাঙা লোকটা ভাল করে নড়বারও সময় পেল না। তিনটে অতিকায় জীব তার ওপর লাফিয়ে পড়ল তিনটে পাহাড়ের মতো।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঢ্যাঙা লোকটাকে তারা শেষ করে ফেলত। কিন্তু লোকটা অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো হাতের টর্চটা তুলে ঘন ঘন সুইচ টিপতে লাগল।

তাতে ব্যাপারটা একটু বিলম্বিত হল মাত্র। তিনটে দৈত্যের মতো জীব ততটা বিক্রমের সঙ্গে না হলেও, অমোঘভাবে এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে। অবশেষে একজন হঠাৎ ঢ্যাঙা লোকটাকে ধরে মাথার ওপর তুলে একটা ডলপুতুলের মতো আছাড় দিল মাটিতে।

ঢ্যাঙা লোকটা চিতপাত হয়ে পড়ে রইল।

তিনটে অতিকায় জীব দ্রুত পায়ে জলার ওদিকে তুঁতেবনের দিকে এগিয়ে গেল। (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

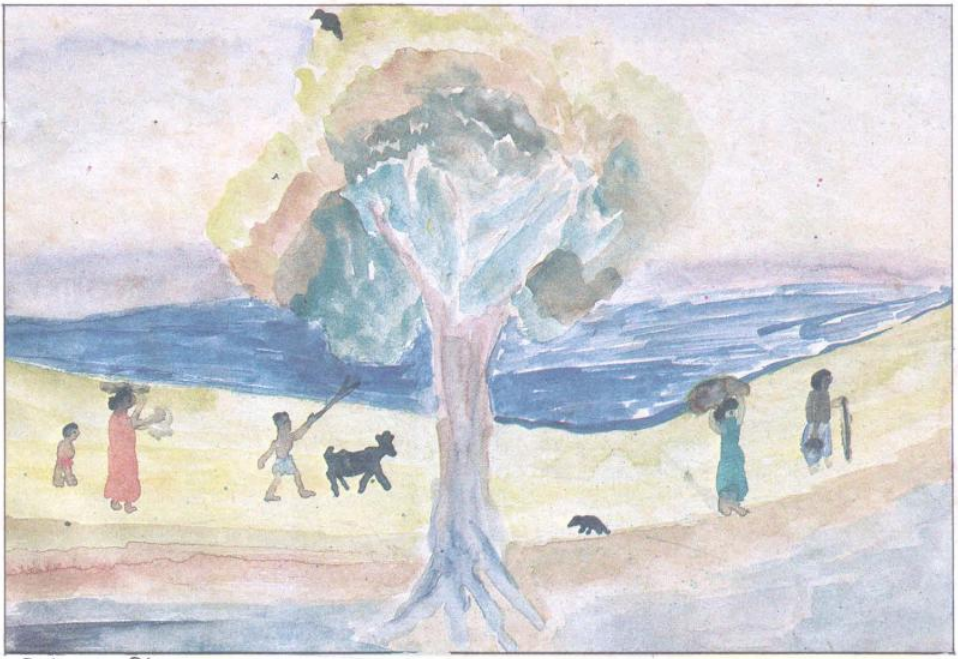

ছবি এঁকেছে **অর্পিতা দে** (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে **মানিনী মণ্ডল** (বয়স ৬)

টেনিদা, আসল টেনিদা ও দারুণ মজার মজার বই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্যের নামে শুধু ছোটদের কেন, বড়দের চিত্তও যে প্রসন্ন হয়ে ওঠে এর কারণ তাঁর রচনার রম্য ভঙ্গি, কাম্য স্বাদ। টেনিদা ও সাকরেদবাহিনীর কীর্তিকাহিনী এখন তো প্রায় কিংবদন্তী, অন্যান্য গল্প-উপন্যাসেও তিনি জলজ্যান্ত করে তোলেন ছোটদের মনের অন্ধিসন্ধিতে লুকনো দুরভিসন্ধির মিষ্টি ঘটনাগুলো। এহেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যাবতীয় ছোটদের রচনা নিয়ে একদিকে যেমন প্রকাশিত হচ্ছে 'সমগ্র কিশোর-সাহিত্য' গ্রন্থমালা, তেমনি আলাদাভাবেও পাওয়া যায় তাঁর মজার মজার গল্পের বইগুলো।

'সমগ্র কিশোর সাহিত্য'র তিন খণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। আরেকটি খণ্ডও বেরুলো বলে। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, ছড়া, আত্মকথা, প্রবন্ধ— এমন সব-কিছু নিয়ে তৈরি হয়েছে একেকটি খণ্ড। সম্পাদনা করেছেন আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

ওহো, এই প্রসঙ্গেই বলি আশা দেবীর 'আসল টেনিদা' নামের বইটির কথা। এর মধ্যে কী আছে জানো ? যে-মানুষটিকে নিয়ে নারায়ণবাবুর টেনিদার গল্প, সেই মানুষটির আসল পরিচয় নিয়ে মজার মজার গল্প।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাসম্ভার : তপন চরিত ১০·০০ ঘণ্টাদার কাবুলকাকা ৮·০০ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৮·০০ টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা ৮·০০ সমগ্র কিশোর-সাহিত্য ১ম ২য় ও ৩য় প্রতি খণ্ড ২৫·০০ টাকা

আশা দেবীর আসল টেনিদা ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মণিমুকুট

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : হোলডার অ্যাণ্ড স্টিভেন্‌স ব্যাঙ্কের প্রধান অংশীদার আলেকজাণ্ডার হোলডারের বক্তব্য, বিখ্যাত একটি মানুষ তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ধার নেন। বদলে বাঁধা রাখেন বেরিল করোনেট, যার দাম হবে প্রায় লক্ষ পাউণ্ড। হোলডার সেই মহার্ঘ মুকুট বাড়িতে নিয়ে সিন্দুকে রাখেন। ভদ্রলোক বিপত্নীক। ছেলে আর্থার বেহিসেবি। কন্যাসমা ভাইঝির নাম মেরি। দুজনেই বেরিল করোনেটের কথা জানে। মাঝরাত্তিরে শব্দ হওয়ায় জেগে উঠে মিঃ হোলডার দেখেন, মুকুটটা হাতে নিয়ে আর্থার দাঁড়িয়ে আছে। মুকুটটা দোমড়ানো, তাতে কয়েকটা দামি পাথর নেই। আর্থারকে পুলিশে দেওয়া হয়েছে। সে কিছু বলছে না। হোমস মিঃ হোলডারের বাড়িতে এসে জানতে পারে, সবজিওয়ালা ফ্রান্সিস আগের রাত্তিরে বাড়ির পরিচারিকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। হোমসের বিশ্বাস, লোকটার একটা পা কাঠের। নিজের বাড়িতে ফিরে হোমস আবার বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে একজোড়া পুরনো জুতো নিয়ে। রাত্তিরেও বেরিয়ে যায় সে। সকালে মিঃ হোলডার এসে জানান, "মেরি আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।"তারপর··

মেরি যে মিঃ হোলডারকে ছেড়ে চলে গেছে, এই খবর শুনে আমি চমকে উঠলুম। কিন্তু হোমসের মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। মিঃ হোলডার বললেন, "হলঘরের টেবিলে আমাকে চিঠি লিখে রেখে চলে গেছে। আমি পরে ওর ঘরে গিয়ে দেখলুম, ঘর খালি। বিছানাটা দেখে বুঝলুম যে, কাল রাত্তিরে মেরি বিছানায় শোয়নি। কালকে আমি কথায় কথায় ওকে দুঃখ করে বলেছিলুম যে, ও যদি আর্থারকে আরও একটু দেখাশোনা করত তা হলে হয়তো ছেলেটা এমন বিগড়ে যেত না। বিশ্বাস করুন, এর জন্যে আমি ওকে দোষও দিইনি বা বকাঝকাও করিনি। স্রেফ একটা কথার কথা বলেছিলুম। হয়তো কথাটা বলা আমারই অন্যায় হয়েছিল। আমার ওই কথাটার সম্বন্ধে মেরি তার চিঠিতেও লিখেছে। মেরির চিঠি পড়ছি শুনুন, 'বাপি, আমার মনে হচ্ছে যে তোমার এই অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী। আমি যদি আরও সচেতন হতুম তা হলে হয়তো এই বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটত না। এ-কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না, আর সেইজন্যে আমার পক্ষে তোমার বাড়িতে থাকা আর সম্ভব নয়। আমার কী হবে ভেবে মন খারাপ কোরো না। আমার ঠিকই চলে যাবে। আমাকে খোঁজবার চেষ্টা কোরো না। খুঁজলেও পাবে না। যেখানেই থাকি, যেমনই থাকি, তোমার কথা আমি ভুলব না কোনওদিন। তোমার মেরি।' আচ্ছা মিঃ হোমস, আপনার কি মনে হয় ও আত্মহত্যা করতে পারে ? এ-চিঠিরই বা কী মানে, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

"না না, আত্মহত্যার কথা ভেবে আপনি মন খারাপ করবেন না। আমার মনে হয় সব দিক দিয়ে ভেবে দেখলে এটাই সবচেয়ে ভাল সমাধান হয়েছে। মিঃ হোলডার, মনে হচ্ছে এবার আপনার সব ঝামেলা চুকে যাবে।"

"আপনি বলছেন মিঃ হোমস ? আপনি কি কিছু টের পেয়েছেন ? মানে আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছেন ? সে পাথরগুলোর সন্ধান পেয়েছেন।"

"প্রত্যেকটা পাথরের জন্যে যদি হাজার পাউণ্ড করে দিতে হয় আপনি দেবেন কি ?"

"আমি দশ হাজার করে দিতে রাজি।"

"না, টাকা খরচ করতে হবে না। তিন হাজার পাউণ্ড হলেই হবে। এর সঙ্গে আপনি যে হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন বলেছিলেন সেটাও দেবেন। আপনার সঙ্গে চেকবই আছে তো ? বাঃ, তা হলে আপনি একটা চার হাজার পাউণ্ডের চেক লিখে দিন।"

মিঃ হোলডারকে দেখে মনে হচ্ছিল যে, যা ঘটছিল তার কোনও কিছুই ওঁর মাথায় ঢুকছে না। একটা ঘোরের মধ্যে উনি চার হাজার পাউণ্ডের একটা চেক কেটে দিলেন। হোমস উঠে তার দেরাজের কাছে গেল। সেখান থেকে একটা তিন-কোনা সোনার পাত নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখল। তাতে তিনটে বেরিল পাথর বসানো।

আনন্দে চিৎকার করে আমাদের মক্কেল সেটা হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন।

"আপনি এটা পেয়েছেন ?" ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে হোমসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওহ্, আমি বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি।"

ঈষৎ কঠিন স্বরে হোমস ভদ্রলোককে বলল, "আপনার কাছ থেকে আমার আরও একটা পাওনা আছে।"

"পাওনা !" কলমটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "বলুন আপনাকে কত দিতে হবে ? আমি আনন্দের সঙ্গে দেব।"

"না, আমাকে কিছু দিতে হবে না। আপনাকে আপনার ছেলের কাছে ভুল স্বীকার করে নিতে হবে। আপনার ছেলে অত্যন্ত চরিত্রবান উঁচু দরের ছেলে। যদি আমার কোনওদিন ছেলে হয় আর এমন ছেলে হয় তো আমি তার জন্যে গর্ব বোধ করব।"

"তা হলে আর্থার এগুলো নেয়নি।"

"আমি তো আপনাকে গতকালই বলেছিলুম আর আজও বলছি যে, না, সে নেয়নি।"

"এ বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত ? তা হলে চলুন আমরা তাড়াতাড়ি তাকে গিয়ে সব কথা খুলে বলি। বলি যে ব্যাপারটার ভালয়-ভালয় নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।"

"সে সবই জানে। যখন গোটা জিনিসটার ফয়সালা হয়ে গেল, তখন আমি আর্থারের সঙ্গে জেলখানায় গিয়ে দেখা করি। প্রথমে তো ও কোনও কথাই বলতে চায়নি। তখন আমি ওকে আগাগোড়া যেমন-যেমন ঘটেছে তেমন-তেমন বলি, তখন অবশ্য ও সব কথা স্বীকার করে। দু-একটা ছোটখাটো জিনিস খোলসা করতেই আমি আর্থারের কাছে যাই। তবে আপনি তার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললে সে হয়তো মুখ খুলতে পারে।"

"তা হলে ঈশ্বরের দোহাই, আপনি আমাকে এই আশ্চর্য রহস্যের মূল কথাটা খুলে বলুন।"

"নিশ্চয়ই আপনাকে বলব। আর আপনাকে দেখিয়ে দেব

কী ভাবে ধাপে ধাপে আমি এই রহস্যের সমাধান করেছি। কিন্তু প্রথমেই যে কথাটা আপনাকে বলব সেটা আমার বলতে খারাপ লাগবে আর আপনার শুনতে আরও খারাপ লাগবে। আপনার ভাইঝি মেরির সঙ্গে সার জর্জ বার্নওয়েলের ভেতরে ভেতরে একটা বোঝাপড়া ছিল। ওরা দুজনেই গা-ঢাকা দিয়েছে।"

"আমার মেরি! অসম্ভব!"

"দুঃখের বিষয় ঠিকই। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। বার্নওয়েল যে কী সাংঘাতিক চরিত্রের লোক তা আপনি বা আপনার ছেলে, কেউই বুঝতে পারেননি। আর না বুঝেই তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে ওর মতন শয়তান প্রকৃতির লোক আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। ওর অবস্থা পড়ে গেছে। লোকটা অসম্ভব জুয়াড়ি, এক নম্বরের শয়তান। ওর চরিত্রে ভাল বলতে কিছুই নেই। ওর না আছে বিবেক, না আছে হৃদয়। আমি জানি না আপনার ভাইঝিকে সে কী বুঝিয়েছিল। যে-কোনও ভাবেই হোক আপনার ভাইঝি তার খপ্পরে পড়ে যায়।"

"আমি একথা বিশ্বাস করি না, আর বিশ্বাস করব না!" মিঃ হোলডারের মুখটা একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

"বেশ, তা হলে সেই রাত্তিরে আপনার বাড়িতে কী হয়েছিল বলি শুনুন। আপনার ভাইঝি, আপনি আপনার ঘরে গেছেন মনে করে, নীচে নেমে এসে জানলা দিয়ে বার্নওয়েলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে বরফের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলে বার্নওয়েলের পায়ের ছাপ ওখানে বেশ ভালমতো বসে যায়। সেই সময়ে বোধহয় মেরি বার্নওয়েলকে ওই মুকুটের কথা বলে। আপনার ভাইঝি আপনাকে খুবই ভালবাসেন, তা সত্ত্বেও কী ভাবে বার্নওয়েল ওঁকে দিয়ে ওই কাজ করাল সেটাই আশ্চর্য। যখন মেরি জানলা দিয়ে বার্নওয়েলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল সেই সময়ে আপনি ওপর থেকে নামছিলেন। আপনার পায়ের শব্দ পেয়ে উনি তাড়াতাড়ি করে জানলা বন্ধ করে দেন। তারপর আপনাকে আপনাদের কাজ করার লোকের চুপিচুপি বাইরে গিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে দেখা করার কথা বলেন। অবশ্য মেরি ও-ব্যাপারে আপনাকে সত্যি কথাই বলেছিলেন।

"আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আর্থার তো ঘরে শুতে গেল। কিন্তু সে রাত্রে মোটেই ঘুম আসছিল না। তার মাথায় ক্লাবের দেনা শোধের ব্যাপারটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। মাঝরাত্রে হঠাৎ তার মনে হল কে যেন তার ঘরের সামনে দিয়ে পা টিপে টিপে চলে গেল। উঁকি মেরে কে গেল দেখতে গিয়ে আর্থার স্তম্ভিত হয়ে দেখল যে তার খুড়তুতো বোন খুব সাবধানে পা টিপে টিপে বারান্দা দিয়ে গিয়ে আপনার ঘরে ঢুকে গেল। কী হয় দেখবার জন্যে আর্থার ওইখানেই চুপ করে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরেই মেরি আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দার ক্ষীণ আলোতে আর্থার অবাক হয়ে দেখল মেরির হাতে ওই মুকুটটা রয়েছে। মেরি সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে যাবার পরই আর্থার নীচে নেমে এসে হলঘরের দরজার যে বড় পর্দা তার আড়ালে লুকিয়ে রইল, যাতে তারপরে কী ঘটছে সে ঠিকমতো দেখতে পায়। আর্থার লক্ষ করল যে মেরি খুব সন্তর্পণে জানলা খুলে বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা কারও হাতে মুকুটটা দিয়ে দিল। তারপর জানলা বন্ধ করে ফের নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। হলের দরজার পর্দা সরিয়ে যাবার সময় আর একটু হলে তার সঙ্গে আর্থারের ধাক্কা লেগে যেত।

"যতক্ষণ মেরি ওই ঘরে ছিল, ততক্ষণ আর্থারের পক্ষে কোনও কিছু করা সম্ভব ছিল না। কেননা তা হলে সব ব্যাপারটা জানাজানি হতই। আর্থার মেরিকে নিজের বোনের মতো ভালবাসত, তাই সে চায়নি যে এই চুরির সঙ্গে মেরির যে যোগ রয়েছে সে কথাটা বাড়ির লোকজনেরা জেনে ফেলুক। মেরি চলে যাবার পরই আর্থার জানলা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়ে। গলির একেবারে শেষ প্রান্তে চাঁদের আলোতে আর্থার দেখতে পায় যে, একজন লোক চলে যাচ্ছে। খালি পায়ে রাস্তায় জমে থাকা বরফের ওপর আর্থার ছুটতে শুরু করে। বার্নওয়েল পালাবার আগেই আর্থার ওকে ধরে ফেলে। তখন ওদের মধ্যে মারামারি ঝটাপটি লেগে যায়। আর্থারের এক ঘুসিতে বার্নওয়েলের চোখের ওপরে ভালমতন কেটে যায়। তা সত্ত্বেও বার্নওয়েল মুকুটটা ছাড়েনি, ধরে ছিল। আর্থারও মুকুটের আর একটা দিক ধরে টানতে থাকে। এই টানাটানির সময়ে ফটাস করে একটা শব্দ হয়। হঠাৎ আর্থার দেখল যে মুকুটটা তার হাতে এসে গেছে। আর তখনই সে সেটা নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করে। তারপর জানলা দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে জানলা বন্ধ করে জিনিসটা নিয়ে ওপরে আপনার ঘরে আসে। আপনার ঘরের মধ্যে এসে সে দেখতে পায় টানাটানিতে মুকুটটা বেঁকে গেছে। যখন সে মুকুটটাকে সোজা করবার চেষ্টা করছিল, তখন আপনি ঘটনাস্থলে এসে হাজির হন।"

"এ যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার," মিঃ হোলডার বললেন।

"আর্থার আশা করেছিল যে, আপনি তার প্রশংসা করবেন, কিন্তু আপনি কিছু না বুঝেটুঝে তাকে যা-তা বলতে লাগলেন। ফলে তারও মেজাজ গেল চটে। অথচ তার পক্ষে চুপ করে থাকা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। সত্যি কথা বলতে হলে মেরির কথা বলতেই হত।"

মিঃ হোলডার বললেন, "ও, এখন বুঝেছি কেন মেরি মুকুটটা দেখে চেঁচিয়ে উঠে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ওহ্, আমি কী নির্বোধ! আর্থার বোধহয় ভেবেছিল যে টানাটানির সময় ওই টুকরোটা রাস্তায় ছিঁড়ে বা খুলে পড়ে গেছে। সেটা খুঁজে দেখতেই ও পাঁচ মিনিটের জন্যে বাইরে যেতে চেয়েছিল। আমি ওকে কত ভুলই না বুঝেছি।"

হোমস বলতে লাগল, "ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রথমেই আমি আপনার বাড়ির চারপাশটা খুব ভাল করে ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলুম। আমার উদ্দেশ্য বরফের ওপর কোনও দাগ বা ছাপ পাওয়া যায় কি না দেখা। আমার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে কাল রাত্তিরের পর থেকে আর নতুন করে তুষার পড়েনি। আর কালকের তুষার জমে শক্ত বরফ হয়ে গেছে। যে রাস্তা দিয়ে পসারিরা যাতায়াত করে সেখানে অনেক লোকের পায়ের ছাপ পড়েছে। একজন আর একজনের পায়ের ছাপ মাড়িয়ে চলে গেছে। সেখানে কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। আপনার রান্নাবাড়ির দরজার সামনে দু'জোড়া পায়ের ছাপ দেখলুম। একজোড়া ছাপের মালিক আপনার কাজের মেয়েটি, আর একজনের একটা পা কাঠের। আমি দাগগুলো ভাল করে

দেখে বুঝতে পারি যে, আপনাদের কাজের মেয়েটিকে হঠাৎ কোনও কারণে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়। মেয়েটি চলে যাবার পরে কাঠের পা-ওলা লোকটি সেখানে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। তারপর আমি বাগানের মধ্যে ঘোরাফেরা করলুম। সেখানে যা ছাপ এদিকে-ওদিকে দেখলুম সেগুলো সবই পুলিশের লোকের পায়ের ছাপ বলে মনে হল। তারপর ঘুরতে-ঘুরতে যখন আস্তাবলের গলিতে এলুম তখন দেখলুম যে বরফের ওপরে সব কথাই স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে।

"আমি দেখলুম যে রাস্তায় দু-সারি বুটজুতো পরা পায়ের ছাপ রয়েছে, আর দু-সারি খালি পায়ের ছাপ পড়েছে। আপনার কাছ থেকে যা শুনেছিলাম তার থেকে বুঝলাম যে, খালি পায়ের দাগের মালিক আপনার ছেলে। বুট-পরা লোকটি দুবারই হেঁটেছে। কিন্তু খালি পায়ের লোকটি দৌড়েছে। আর কোথাও-কোথাও খালি পায়ের ছাপ বুটজুতোর ছাপের ওপরে পড়েছে। তার থেকে বুঝতে পারলুম, খালি পায়ের লোকটি বুটজুতো পরা লোকটির পরে গেছে। বুটজুতোর ছাপটা লক্ষ করে এগিয়ে দেখলুম, সেটা হলঘরের জানলার কাছে এসে থেমে গেছে। আর সেখানে অনেকক্ষণ লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল বলে বরফের ওপরে গর্ত হয়ে গেছে। তারপর আমি ওই পায়ের ছাপ ধরে উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করলুম। প্রায় একশো গজ যাবার পর দেখলুম পায়ের ছাপ আবার উলটো দিকে পড়েছে। সেখানে বরফের ওপরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন আর রক্তের দাগ দেখতে পাই। আর একটু এগিয়ে দেখি বুটজুতোর ছাপের পাশে রক্তের দাগ। তখন বুঝলাম যে, বুটজুতো-পরা লোকটি আহত হয়েছে। বড় রাস্তায় পৌঁছে দেখলুম ফুটপাথ পরিষ্কার করা হয়েছে। তাই বুটজুতো পরা লোকটি কোনদিকে গেছে সেটার আর হদিস পেলাম না।

"তারপর আমি ফিরে এসে আপনার হলের জানলার ফ্রেমটা আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝতে পারি যে, কেউ জানলা দিয়ে গলে গেছে আর এসেছে। জানলার ফ্রেমের নীচের কাঠে আমি ভিজে পায়ের ছাপ দেখতে পাই। তখনই ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। বাইরের জানলার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল, বাড়ির ভেতর থেকে কোনও একজন ওই মুকুটটা তাকে পাচার করে। এ ব্যাপারটা আড়াল থেকে তৃতীয় কোনও একজন দেখতে পায়। তারপরে সে চোরের পেছনে ধাওয়া করে চোরকে ধরে ফেলে। মুকুটটা ছিনিয়ে নেবার জন্যে দু'জনের মধ্যে জোর টানাটানি শুরু হয়ে যায়। আর প্রাণপণ টানাটানির মধ্যে মুকুটের একটা অংশ খুলে যায়। সেই অংশটা চোরের হাতে পড়ে। যে লোকটি চোরকে তাড়া করেছিল তার হাতে বাকিটা থেকে যায়। এ পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিকই আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল রাস্তায় যে লোকটি অপেক্ষা করছিল সে কে? আর ঘর থেকে যে লোকটি তার হাতে মুকুটটা পাচার করেছিল সে-ই বা কে?

"আমার একটা সূত্র আছে। সেটা হল যে, সব রকম সম্ভাবনা ভুল প্রমাণ হলে যেটা বাকি থাকে সেটা যতই অসম্ভব বলে মনে হোক না কেন, সেটাই সত্যি। আর যেহেতু আপনি সেটা নামিয়ে আনেননি তা হলে সেটা হয় আপনার ভাইঝি নয় তো কাজের লোকেরা ওপর থেকে নামিয়ে আনে। এখন কথা

হল যদি কাজের লোকেরা মুকুটটা পাচার করত তা হলে আপনার ছেলে শুধু-শুধু নিজের ঘাড়ে দোষটা নিতে যাবে কেন? এটা মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু আর্থার তার খুড়তুতো বোনকে খুবই ভালবাসে, তাই তার খুড়তুতো বোনই যদি জিনিসটা পাচার করে থাকে তা হলে তার পক্ষে চুপ করে থাকাই স্বাভাবিক। কেননা ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে ভীষণ বিচ্ছিরি কাণ্ড হবে। তখন আপনার দুটো কথা আমার মনে পড়ল। এক, আপনি মেরিকে হলঘরের জানলার কাছে দেখেছিলেন। দুই, মুকুটটা দেখে মেরি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এ দুটোর থেকে আমি বুঝে নিলুম যে আমার অনুমানটা নিছক অনুমান নয়, সেটাই সত্যি।

"এখন প্রশ্ন হল এই ব্যাপারে মেরির সঙ্গী কে? আপনার কাছ থেকে জেনেছিলুম, আপনারা মোটেই মেলামেশা করেন না। বাইরের লোকের মধ্যে সার জর্জ বার্নওয়েলই আপনাদের বাড়িতে প্রায়ই আসেন। বার্নওয়েল যে সুবিধের লোক নয় তা আমি আগেই শুনেছি। তাই আমি বার্নওয়েলকেই মেরির শাগরেদ বলে সন্দেহ করলুম। তা যদি হয় ওই বুটজুতোর ছাপগুলো বার্নওয়েলের আর তা হলে পাথরগুলো নিশ্চয়ই ওর কাছে আছে। এই রকম আন্দাজ করে আমি ভবঘুরে বেকারের ছদ্মবেশ ধরে সার জর্জের বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলুম। সার জর্জের খাস চাকরের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নগদ ছ' শিলিং খরচা করে সার জর্জের একজোড়া পুরনো জুতো কিনলুম। ওই চাকরের কাছেই খবর পেলুম যে, আগের রাত্তিরে একটা ছোটখাটো দুর্ঘটনায় সার জর্জের চোখের ওপরে বেশ খানিকটা কেটে গেছে। সেখান থেকে আমি চলে গেলুম স্ট্রেথ্যামে। সেখানে যেখানে-যেখানে বরফের ওপর বুটের ছাপ ছিল সেখানে ওই ছাপের সঙ্গে সার জর্জের বুটজুতোর মাপ একদম মিলে গেল।"

"হ্যাঁ, কাল সন্ধেবেলায় আস্তাবলের গলিতে একজন নোংরা জামাকাপড় পরা লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলুম বটে," মিঃ হোলডার বললেন।

"ঠিকই দেখেছেন। আমিই সেই লোক। যখন নিশ্চিতভাবে বুঝলুম যে, ঠিক লোককেই ধরেছি তখন আমি

জেনে নাও

ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে কেন

ভেজা বা কাঁচা কাঠ, ঘুঁটে, ঘাস-পাতায় আগুন দিলে খুব বেশি ধোঁয়া হয়। ওই ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে। কেন ?

ধোঁয়া যখন হয়, তখন সীমায়িত জারণ চলে। এই জারণের জন্যে কিছু জৈব রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। যদি এদের রাসায়নিক পরিচয় দিই, তা হলে বলতে পারি, এদের মধ্যে আলডিহাইড বর্গের কিছু-কিছু পদার্থ আছে। এরা চোখের স্নায়ুতন্ত্রীর সংস্পর্শে এসে উত্তেজনা ঘটিয়ে চোখে জ্বালা ধরায়।

শীতকালে ঠোঁট ফেটে যায় কেন

শীতকালে ঠোঁট ফাটে, অথচ গরমে নয়। কেন ? আমাদের চামড়ায় এক রকমের গ্রন্থি আছে, এর নাম সেবেসিয়াস গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে তেলজাতীয় এক ধরনের পদার্থ বেরিয়ে আসে। যখন অবস্থাটা স্বাভাবিক, তখন এই তেলজাতীয় পদার্থটা ঘামের সঙ্গে মিশে চামড়ার উপরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে চামড়াটা তেলতেলে আর নরম থাকে। কিন্তু শীতকালে অবস্থাটা অন্য রকমের। তখন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়, পরিবেশের উষ্ণতাও কম থাকে। তাই তেমন ঘাম বার হয় না। সেইজন্যে সেবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে আসা তেলতেলে পদার্থটা চামড়ার উপরে ভালভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় ঠোঁটটাই বেশি ফাটতে দেখা যায় কেন ?

আসলে ঠোঁটের চামড়া পাতলা। তা ছাড়া তা নাকের কাছাকাছি থাকার জন্যে ঠোঁটের চারপাশে বায়ু চলাচল বেশি হয়। তাই ওই জায়গাটা আরও শুষ্ক হয়ে পড়ে। শীতকালে শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় ঠোঁট ফাটার কথাটাই যেন বেশি করে মনে হয়।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

বাড়ি ফিরে এলুম। বাড়ি ফিরে পোশাক বদলে নিয়ে ফের বেরলুম। এবারেই হল আসল মুশকিল। বার্নওয়েলকে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করার মতো প্রমাণ আমার হাতে কিছুই নেই। তা ছাড়া কোর্ট-কাছারি পর্যন্ত ব্যাপারটা যদি গড়ায় তো কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা বার্নওয়েল মহা ধড়িবাজ। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সব দিক ভেবে আমি বার্নওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

"প্রথমটায় বার্নওয়েল তো আমাকে ফুঃ ফুঃ করে উড়িয়েই দিচ্ছিল। তখন আমি তাকে গোড়া থেকে যা-যা ঘটেছে, তা পরপর বলে গেলুম। আমার মুখে সব কথা শুনে ও তো আমাকে ডাণ্ডা নিয়ে মারতে এল। বার্নওয়েল যে এরকম একটা কিছু করতে পারে তা আমি অনুমান করেছিলুম। আর তার জন্যে আমি মনে মনে তৈরি ছিলুম। ও ডাণ্ডাটা তোলবার আগেই আমি আমার পিস্তলটা ওর দিকে বাগিয়ে ধরলুম। এতক্ষণে বার্নওয়েল যেন ধাতস্থ হল। তখন আমি তাকে বললুম, সে যদি পাথরগুলো আমাকে ফিরিয়ে দেয় তা হলে আমি তাকে প্রত্যেকটি পাথরের জন্যে হাজার পাউণ্ড করে দেব। আমার কথায় বার্নওয়েল যেন একেবারে চুপসে গেল। 'সে কী ! আমি যে মাত্র ছশো পাউণ্ডে সব কটা বিক্রি করে ফেলেছি।'

"বার্নওয়েল তো কিছুতেই বলতে চায় না যে কার কাছে ওই পাথরগুলো সে বিক্রি করেছে। আমি যখন তাকে কথা

আগামী সংখ্যায় শুরু হচ্ছে

শার্লক হোমসের নতুন গল্প

বস্কোম্ব ভ্যালিতে খুন

দিলুম যে, তার বিরুদ্ধে আমরা কোনও মামলা করব না তখন সে সেই দোকানদারের নাম-ঠিকানা বললে।

"বার্নওয়েলের কাছ থেকে বেরিয়ে প্রথমে গেলুম জেলখানায় আপনার ছেলে আর্থারের সঙ্গে দেখা করতে। আর্থারকে সব কথা বলে গেলুম সেই দোকানদারের সন্ধানে। সেখান থেকে আপনার জিনিস উদ্ধার করে যখন বাড়ি ফিরলুম রাত তখন আড়াইটে।....ওহ্, কাল সারাদিন বেজায় খাটাখাটনি গেছে।" শার্লক হোমস চুপ করল।

মিঃ হোলডার বললেন, "আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। আপনি আমার একার নয়, সারা দেশের মুখ রক্ষা করেছেন। তবে আর একটা রহস্যের সমাধান এখনও হল না—"

মিঃ হোলডারকে বাধা দিয়ে হোমস বলল, "আপনি কী বলতে চাইছেন বুঝেছি। মেরির খোঁজ না করাই আপনাদের পক্ষে ভাল।"

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী পঙ্গু। ছেলে সায়ন স্কুলের ছুটিতে বাগানে এসেছিল। কাছেপিঠে ডাকাতি হচ্ছে। রাত্তিরে দূরের পাহাড়ে সাংকেতিক আগুন জ্বলে। তার অর্থ জানে বুধুয়া-বুড়ো। সায়ন একটা সওয়ারহীন ঘোড়ায় উঠেছিল। ঘোড়া তাকে নিয়ে ছুটানের জঙ্গলে ঢোকে। সেখানে যিনি বিষাক্ত বিছের কামড় থেকে তাকে বাঁচান, সেই সুধাময় নেতাজির ফৌজে ছিলেন, ইংরেজদের হাতে বন্দী হন, পালিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার কথা তিনি জানেন না। সায়নকে তিনি এক জংলি উপজাতির মানুষদের কাছে নিয়ে যান। বলেন, এখানেই যখন থাকতে হবে, "এদের কথা বোঝার চেষ্টা করো।" এদের পোশাকে সেই আগুন-চিহ্ন, যা দেখে বুধুয়া-বুড়ো ভয় পেয়েছিল। ঘোড়ায় চড়ে কিছু লোক সেখানে এল, চা-বাগানের কাছে যাদের দেখেছিল সায়ন। আড়াল থেকে সায়ন লক্ষ করল, লোকগুলো সুধাময়কে অনুসরণ করছে। খানিক এগিয়ে সায়ন সে গুহায় ঢুকল, সেখানে প্রচুর প্যাকিং বাক্স। একটু এগোতেই মাথার পিছনে তীব্র যন্ত্রণা। লুটিয়ে পড়ল সে। তারপর ...

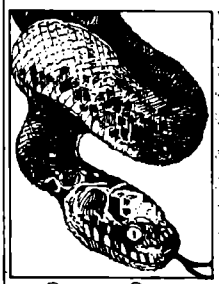

সায়নের যখন জ্ঞান ফিরল তখন বিকেল শেষ, কিন্তু অন্ধকার নামেনি। মাথার পিছনে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। হাত বোলাতেই মনে হল আবের মতো উঁচু হয়ে আছে জায়গাটা। প্রচণ্ড টনটন করছে। কেউ তাকে শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করেছিল। অথচ তার আশেপাশে কোনও মানুষকে সে দ্যাখেনি। তার মানে যে এসেছিল সে চুপিসারে এসেছিল। যে-ই মারুক সে চায়নি সায়ন ওই গুহায় ঢুকুক। কেন ? এই যন্ত্রণাতেও সায়নের চোখে বাক্সগুলো ভেসে এল। ওই বাক্সগুলোর মধ্যেই নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে।

সায়ন চোখ তুলে তাকাল। কাছেপিঠে কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সে তো গুহার মধ্যে শুয়ে নেই ! দূরে ঝাপসা আলো দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু এই জায়গাটা বেশ স্যাঁতসেঁতে। সে উবু হয়ে বসল। এবং তখনই সে টের পেল, তাকে একটা বড় গর্তের মধ্যে ফেলে রেখেছিল ওরা। অনেক ওপরে মরা-আলোমাখা আকাশ ঝুলছে। গর্তটা নতুন খোঁড়া নয়। চারপাশে মসৃণ পাথর। সায়ন উঠে দাঁড়াল। খুব কাহিল লাগছে নিজেকে। মাথা দপদপ তো করছিলই, এখন পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। অনেকক্ষণ না খেলে এই রকমটা হয় নাকি ?

কিন্তু যারা তাকে এখানে রেখেছে, তারা কোথায় ? এত নীচে সে এল কী করে ? ওরা নিশ্চয়ই ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি। তা হলে হাত পা মাথা আস্ত থাকত না। ওপর থেকে নীচে নামবার কোনও রাস্তা নিশ্চয়ই আছে। এই মুহূর্তে সায়ন বুঝতে পারল, সে বন্দী। এবং সেটা বোঝামাত্র একটা হতাশা এবং ভয় তার মনে ছড়িয়ে পড়ল। বন্দী করে রাখা হয় শত্রুকেই। সে যদি ওই মানুষগুলোর শত্রু হয়ে যায়, তা হলে এখানে থাকবে কী করে ? এখনই সুধাময় সেনের সঙ্গে তার যোগাযোগ হওয়া দরকার। সায়নের মনে তীব্র অভিমান এল, সুধাময় এতক্ষণ তার খবর না নিয়ে আছেন কী করে ? তিনি নিশ্চয়ই জানেন না সায়নের অবস্থার কথা।

যেটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছিল এখন, তাতেই বোঝা গেল, সন্ধে হতে বেশি দেরি নেই। অবশ্য ইতিমধ্যেই গুহার মধ্যে আবছা অন্ধকার ছড়াচ্ছে। সেইসঙ্গে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসছে মশারা। সায়ন দু'হাতের চাপে কয়েকটা মেরে হাঁ হয়ে গেল। প্রায় মাছির সাইজ এক-একটা। সায়ন দ্রুত গর্তের দেওয়াল হাতড়াতে লাগল। একটু পা রাখার মতো খাঁজ পেলেই সে উঠে যেতে পারবে ওপরে। তারপরেই তার খেয়াল হল, ওপরে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই তো ওরা তাকে ধরে বেঁধে আবার নীচে ফেলে দিতে পারে। কিংবা আরও ভয়ানক ধরনের কিছু। অতএব তাড়াহুড়ো করে ওপরে উঠে কোনও লাভ হবে না। আর একটু রাত হোক, আর একটু নির্জন হোক।

সায়ন দু' হাতে মশা তাড়াতে চেষ্টা করল। ওপরে কোথাও নিচু আওয়াজে মাদলের মতো বাজনা বাজছে। চা-বাগানের কুলি লাইনে যে তালে বাজে এটা সে তাল নয়। কেমন যেন ভয়-ভয় লাগে। সায়ন গর্তের একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, যাতে পেছন থেকে মশারা তাকে কামড়াতে না পারে। মাথার ওপর আকাশটা এখন প্রায় নিভে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। চারপাশে এমন অন্ধকার যে এক হাত দূরে কিছু আছে কি না ঠাহর করা যাচ্ছে না ! কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর সায়নের চোখে জল এসে গেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। বিশ্বচরাচর বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল সে। হঠাৎ মনে হল, তার ডান হাতে ঠাণ্ডা কিছু স্পর্শ করছে। এতক্ষণ টের পায়নি, এখন দেখল হাতটাই শীতল হয়ে গেছে। সায়নের কান্না বন্ধ হল। সে অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস পাশের দেওয়াল চুঁইয়ে আসছে গর্তের ভেতরে। যেহেতু সে আসার পথটা জুড়ে দাঁড়িয়ে, তাই সেটা সরাসরি আঘাত করছে তাকে। এদিক থেকে বাতাস আসবে ভাবা যায় না। তারপরেই সায়নের মাথায় চিন্তাটা ঢুকল। বাতাস তো এমনি-এমনি আসতে পারে না। নিশ্চয়ই দেওয়ালটাতে ফাঁক আছে। অর্থাৎ গর্তটার এপাশে পাহাড় আড়াল হয়ে নেই।

অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল সে। মিনিট পনেরো চলে গেল, কিন্তু অবস্থার একটুও পরিবর্তন হল না। হাওয়া আসছে ঠিকই, কিন্তু সেই আসার পথটাকে বড় করতে যে শক্তি এবং অস্ত্র দরকার তা সায়নের নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে সে হতাশ হয়ে পড়ল। শুধু ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস পা চুঁইয়ে ঢুকছিল ভেতরে, সেটুকুই মুখে স্বস্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছিল।

অনেকক্ষণ মাথার ওপরে তাকায়নি সায়ন। এবার মুখ তুলতেই চিকচিকে কিছু দেখতে পেল। ওটা কি তারা ? একটা তারা অত বড় হয়ে জ্বলছে ? তার পরেই সে আকাশের এক কোণে কালো ছায়া দেখতে পেল। ছায়াটা যেন সামান্য ঝুঁকে সরে গেল আধুলির মতো নীলচে-ছাই আকাশটাতে তারাটাকে জ্বলতে দিয়ে। এবং সেই সময় একটা শীতল স্পর্শ

অনুভব করতে ছিটকে সরে গেল সায়ন। সরু এবং কিলবিলে কিছু তাকে স্পর্শ করে দুলতে লাগল দেওয়ালের পাশে। সাপ! শিউরে উঠল সায়ন। সাপটা ওপর থেকে নেমে এল কী জন্যে? এই অন্ধকার গুহাটা কি ওর আস্তানা? কিছু সময় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকেও আক্রান্ত হল না সে। অথচ যে-কোনও মুহূর্তেই একটা তীব্র ছোবল আশঙ্কা করছিল। এবার একটু-একটু করে বুকে সাহস ফিরে এল। সায়ন ওপরের দিকে তাকাল। অন্ধকারের এক রকম মায়াবী আলো থাকে। খুব সন্তর্পণে সেই আলো-আঁধারের গায়ে মিশে থাকে। অভ্যস্ত হয়ে গেলেই সেই আলোয় কিছু দেখতে পাওয়া সম্ভব। সায়ন দেখল। গর্তের ওপর থেকে সাপটা নেমে এসেছে এত নীচে। এখনও তার শরীরের শেষাংশ ওই উঁচুতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু একটা সরু সাপ কি এত লম্বা হতে পারে? খামোখা ওটা ঝুলে থাকতে যাবেই বা কেন? কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর সায়নের মনে হল, জিনিসটা দড়ি নয় তো? কিন্তু দড়ি ঠাণ্ডা হবে কেন? স্পর্শটা যে এখনও তার খেয়ালে আছে। সে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করল। জিনিসটা যাই হোক, একটুও নড়াচড়া করছে না। সায়ন দেখল ওপরের আকাশকে সামান্য আড়াল করে একটা ছায়া এগিয়ে এসেই আবার সরে গল। যেন কেউ ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়েই চলে গেল।

ওটা যে মানুষের ছায়া তা এতক্ষণে বুঝতে পারল সায়ন। মানুষটা নিশ্চয়ই সুধাময় সেন নন। তা হলে তিনি নিশ্চয়ই তাকে উঁচু গলায় ডাকতেন। তখনই সায়ন স্থির বুঝল, ওটা সাপ নয়। প্রথম কথা এত দীর্ঘ সাপ হতে পারে না। লম্বা সাপেরা সরু হয় না। আর সাপের লেজ ওপরে আছে এখনও, কোনও মানুষ তা দেখেও বারে-বারে আসবে না। সায়ন এক পা এক পা করে এগোল। পাতলা অন্ধকারেও সে বুঝল, জিনিসটা স্থির হয়ে আছে। তার হাত কাঁপছিল। আচমকা সে স্পর্শ করতেই মনে হল সমস্ত শরীরে উত্তাপ ফিরে এল।

সাপ নয়, দড়ি নয়, একটা শক্ত সরু লতা ঝুলছে ওপর থেকে। ঠিক বেতের মতো ঠাণ্ডা। দু'হাতে লতাটা ধরে টানল সে। না, ওটা ওপর থেকে সর-সর করে নেমে এল না। মনে হচ্ছে, লতাটার শেষ প্রান্তে কোথাও শক্ত করে বাঁধা আছে। সায়ন বুঝতে পারল, কেউ এই লতাটাকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে তাকে সাহায্য করার জন্য, আর সে এতক্ষণ অযথা বোকার মতো ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু তাকে সাহায্য করবে কে? সায়ন আর সময় নষ্ট করল না। দু'হাতে লতা আঁকড়ে ধরে বুঝল, এইভাবে ওপরে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব। সার্কাসের লোকরা যেভাবে দড়ি বেয়ে সর-সর করে ওপরে উঠে যায়, সে সেই কায়দাটা জানে না। কিন্তু তাকে ওপরে উঠতেই হবে। লতাটা আঁকড়ে ধরে সে গর্তের দেওয়ালে পা রাখল। সমস্ত শরীর টলছিল। কিন্তু একটু একটু করে সে হাতের মুঠো খুলে লতার ওপরের অংশ ধরতে পারল। এবার দুটো পা দেওয়ালের ওপরের অংশে নিয়ে গেল সায়ন। লতাটা খুব দুলছে। কিন্তু এই ভাবেই তাকে ওপরে উঠতে হবে। সায়ন বুঝতে পারছিল, একবার যদি তার হাত পিছলে যায় তা হলে একদম নীচে আছড়ে পড়তে হবে। কিন্তু লতাটা যেহেতু মসৃণ নয় তাই হাত আটকে থাকছে গাঁটে।

কত সময় লেগেছিল সায়ন জানে না, কিন্তু হঠাৎ সে সমস্ত আকাশটাকে তার ওপর উপুড় হয়ে আসতে দেখল। দু'হাতে গর্তের কিনারা ধরে শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে তুলে হাঁপাতে লাগল সায়ন। তারপর লতাটাকে টেনে জড়িয়ে নিল হাতে। হাতের নাগালের মধ্যেই একটা সরু গাছের গায়ে ওর শেষ প্রান্তটা বাঁধা ছিল। বসে বসেই সেটাকে খুলে নিল সে।

ধাতস্থ হওয়ামাত্র তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সায়ন। যারা তাকে এই গর্তে ফেলে রেখেছিল, তারা যদি জানতে পারে সে ওপরে উঠে এসেছে, তা হলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে না। সে দৌড়ে ওপাশে একটা বড় পাথরের আড়ালে চলে এল। এখন বেশ অন্ধকার নেমেছে পৃথিবীতে। চারধার অত্যন্ত নিঃশব্দ। দুপুরে যে মানুষগুলো এখানে মেলা করে ছিল, তারা আর কেউ এখানে নেই। এবং এই সময় মৃদু শব্দ কানে আসতে চমকে পেছন ফিরে তাকাতেই সে বৃদ্ধাকে দেখতে পেল। পিছনে জঙ্গলের সীমানায় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা সেই স্বল্পালোকে তাকে ইশারায় কাছে ডাকছে। সায়ন বৃদ্ধাকে চিনতে পারল। দুপুরে এরই পাশে ছিল সে। বৃদ্ধার মুখে সস্নেহ হাসি। কিন্তু ভাবভঙ্গিতে সতর্কতা।

সায়ন আর কোনও কিছু ভাবতে পারছিল না। বৃদ্ধা যখন তাকে দ্রুত সরে আসতে বলছেন, তখন তা মান্য করা উচিত। তাকে ছুটে আসতে দেখে বৃদ্ধা জঙ্গলের মধ্যে চলে এল। সায়ন সামনে দাঁড়াতে দু'হাত নেড়ে প্রাণপণে ইশারা করতে লাগল বৃদ্ধা। বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর সায়ন তার অর্থ ধরতে পারল। পালাও, এখানে থেকো না। দূরের জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে সেই আঙুলে আবার গর্তের ভেতরটা বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল বৃদ্ধা। ঠিক সেই সময় গলার স্বর শুনতে পেল ওরা।

বৃদ্ধা চকিতে সায়নকে টেনে নিয়ে এল একটা গাছের আড়ালে। ওপাশে উপত্যকার ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে কয়েকজন মানুষ। তাদের মধ্যে সুধাময় সেনকে চিনতে পারল সায়ন। কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে ওরা। সুধাময়ের সঙ্গে যারা, তাদের প্রত্যেকের মাথা কামানো। বৃদ্ধা সায়নের হাত ধরে টানছিল স্থানত্যাগ করার জন্য। কিন্তু সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ উপত্যকার দিকে। কথা বলতে বলতে সুধাময় এসে দাঁড়ালেন সেই গর্তটার সামনে। ন্যাড়া-মাথা একটা লোক হাত-পা নেড়ে কিছু বোঝাচ্ছে তাঁকে। তার মানে সুধাময় জানতেন যে, তাকে ওই গর্তে ফেলে রাখা হয়েছে কিন্তু তিনি সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেননি! সমস্ত ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে গেল সায়নের কাছে। ওরা যে ভঙ্গিতে সুধাময়কে খাতির করছে, তাতে তিনি ইচ্ছে করলেই সে বিপন্মুক্ত হতে পারে। কিন্তু সুধাময় সেই ইচ্ছেটা করছেন না। কারণ তিনি এখনও গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে সহজ ভঙ্গিতে ওদের ভাষায় গল্প করে যাচ্ছেন। হঠাৎ সায়নের মনে পড়ল লতাটার কথা। ভাগ্যিস লতাটাকে খুলে নিয়ে এসেছে, নইলে এতক্ষণে ওরা টের পেয়ে যেত সে গর্তে নেই। সুধাময় কিছু বললেন। এবার একটা ন্যাড়া লোক সঙ্গের ঝোলা থেকে কিছু বের করে গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। তারপর ওরা যে পথে এসেছিল, সেই পথে ফিরে গেল। ওরা গর্তে কী ফেলল? সায়নের মনে হল, নিশ্চয়ই খাবার। সুধাময় তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য খাবার দিয়ে গেলেন। এখন সায়নের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। সুধাময় যা বলেছেন নিজের

সম্পর্কে, সেটা কি সত্যি নয় ? সে আসায় সুধাময় কি বিরক্ত হয়েছিলেন ? এতদিনের ব্যবহারে সে-কথা মোটেই বুঝতে পারেনি সায়ন। কেউ বিরক্ত হয়ে কথা বললে তো বোঝা যায় ! তাকে এখানে নিয়ে আসার কারণ কি এইভাবে সরিয়ে দেওয়ার জন্যেই ! তাই যদি হয়, সেটা তো তিনি তাঁর গুহাতেও করতে পারতেন। নাকি তার পক্ষে ওই বাক্সগুলো দেখাই চূড়ান্ত অপরাধ হয়ে গিয়েছে।

এই সময় বৃদ্ধা আবার তার হাত ধরে টানল। সায়ন ঘুরে দাঁড়াতে বৃদ্ধা হাঁটতে লাগল। জঙ্গলের পথ এদের এত চেনা যে অন্ধকারেও অসুবিধে হচ্ছিল না। এইসময় মাথার ওপর একটা রাতজাগা পাখি সুরেলা গলায় ডেকে উঠল কু-উ-ব্। সুর থাকলেও স্বরটা ভারী। এত বিপদের মধ্যেও সায়নের মনে পড়ল, ঋজুদা-রুদ্রর গল্পের কথা। লেখক ঠিকই লেখেন, ঠিক-ঠিক।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর বৃদ্ধা দাঁড়াল। তারপর হাত বাড়িয়ে দূরের জঙ্গল দেখিয়ে দিল। তার মানে ওই পথ দিয়ে চলে যাও। কিন্তু একা সে ওই জঙ্গলে রাতের অন্ধকারে কোথায় যাবে ? কিছু বলার আগেই বৃদ্ধা তার অন্য হাতে রাখা একটা পাতায় মোড়া গোলাকার বস্তু তুলে দিল সায়নের হাতে। এই সময় দূরে কোথাও মাদল বেজে উঠতেই বৃদ্ধা চমকে উঠল। দ্রুত হাতে চলে যেতে ইশারা করে সে ছায়ার মতো জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। মাদলের শব্দটা কি কোনও সঙ্কেত ? সায়ন সামনে ছুটতে লাগল। খানিকটা খোলা জায়গা পেরিয়ে সে নতুন করে আবার জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর তার শরীর আর সইতে পারছিল না। প্রচণ্ড খিদে পাক খাচ্ছে পেটে। মাথা ঝিমঝিম করছে। ওরা যদি দ্যাখে সে গর্তে নেই, তা হলে কি খুঁজতে বের হবে ? হঠাৎ তার মনে হল নিস্তার নেই। ওই বাক্সগুলো দেখাই তার কাল হয়েছে। ওরা তাকে খুঁজে বের করবেই। এই জঙ্গলটা নিশ্চয়ই ওদের ভীষণ জানা।

এখন সে চলতে পারছে না। জঙ্গলে বন্য জন্তু অবশ্যই আছে। কী করবে প্রথমে ঠাহর করতে পারছিল না সায়ন। তারপর তার চোখে পড়ল বেশ ঝাঁকড়া ধরনের একটা গাছ এবং সেটার নীচের ডালটা বেশ কাছে। সায়ন স্থির করল, ওই গাছে উঠে আজকের রাতটা কাটিয়ে দেবে। নীচে দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে গাছের ওপরে আশ্রয় নিলে কিছুটা বিপদ কমবে। ডালটা ধরতে গিয়ে তার খেয়াল হল, বৃদ্ধার দেওয়া বস্তুটার কথা। সন্তর্পণে পাতা সরাতে সায়ন চমৎকার একটা ঘ্রাণ পেল। চোখের সামনে নিয়ে এসে সে পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝল, ওটা নরম সেঁকা-মাংস। নিশ্চয়ই সেই হরিণটার মাংসর ভাগ বৃদ্ধা পেয়েছিল, কিন্তু নিজে না খেয়ে তাকে দিয়ে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে গেল। এখন বুঝতে বাকি নেই, বৃদ্ধাই গর্তের মধ্যে লতা ঝুলিয়ে দিয়েছিল উঠে আসার জন্যে। মাঝে-মাঝে সে-ই ঝুঁকে দেখেছে গর্তে। সায়ন ঠোঁট কামড়াল। তারপর নিজেকে সামলে মাংসের একটা টুকরো জিভে দিতেই মুখ জলে ভরে গেল। আর এইসময় দূরে জঙ্গল ভাঙার শব্দ শুরু হল। কালবিলম্ব না করে হাতের মাংস সামলে ঝাঁকড়া গাছের নিচু ডালটা ধরে ওপরে উঠতে লাগল সায়ন। (ক্রমশ)

ডাক্তারবাবু বলছেন

হেমন্তকালে কী করবে

হেমন্তকালে সন্ধে থেকেই বেশ হিম পড়ে। সন্ধের পর আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রাত্রে শীতের দাপট বাড়তে থাকে, দিনের বেলায় গরম পড়ে। আমাদের শরীরে ঠাণ্ডা গ্রহণ করার জন্য আলাদা একরকমের কোষ আছে, যার ইংরেজি নাম 'মেমব্রেন অব ক্রজ'। এই কোষগুলো বেশি থাকে কানে, নাকে মুখে, গলায় ও হাত-পায়ের চামড়ায়। সেইজন্যে আমাদের দেহে শীত-অনুভূতি প্রবেশ করে সবচেয়ে বেশি এইসব জায়গা দিয়ে। আমরা গরম জামা-কাপড় পরে শরীরটাকে ঢাকা দিই, কিন্তু হাত পা গলা মুখ খোলা থাকে, সেইজন্য চট করে ঠাণ্ডা লেগে যায়।

খুব ভাল করে তেল মেখে গরম-ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে এই সময় স্নান করা উচিত। কান নাক চোখে ঠাণ্ডা লেগে ব্যথা হলে, সকাল বিকেল চোখ কান নাক গরম জলে ধুয়ে ফেললে দিন কয়েকের মধ্যেই ব্যথা কমে যাবে। পায়ে ব্যথা হলে একটা গরম জলের বালতি বা টবে পা চুবিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই ব্যথা কমে যাবে। যদি

জ্বর-জ্বর হয়, কোনও ওষুধ খাবে না। এই সময়ে নিরানব্বুই ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত জ্বর উঠলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। একে জ্বর বলে ভেবো না। গরম জলে তেল মেখে স্নান করে তিনদিন ভাতের বদলে রুটি খাবে, দেখবে আপনা থেকেই শরীর সুস্থ হয়ে গেছে।

ব্যায়াম কিন্তু রোজ সকালে করতে হবে। কী ব্যায়াম করতে হবে তা তো আগেই বলেছি। ব্যায়াম করলে শরীরের সর্বাঙ্গে রক্ত-চলাচল বেড়ে যায়, আর তার ফলে কোষগুলি সতেজ হয়ে ওঠে। কোষগুলি সজীব থাকলে আর ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকে না।

তিন দিনের পরও যদি দ্যাখো যে, জ্বর কমছে না, তা হলে ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে তাঁর পরামর্শ নেবে।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

ধাঁধা

দুর্গাপুজো শেষ, লক্ষ্মীপুজো শেষ, এমনকী কালীপুজোও শেষ। তবু উৎসবের রেশ এখনও ফুরোয়নি। আবার যেন নতুন করে পুজো-বাজার শুরু হয়েছে। অত বড় বাজার হয়তো নয়, কিন্তু কমই বা কী এমন।

এই আমার কথাই ধরো না। পুজোয় জামাকাপড় থেকে এখনও নতুন গন্ধ যায়নি। কিন্তু হলে হবে কী, আবার পাব সেই কোরা-গন্ধ শার্ট বা প্যান্ট, কিংবা ধুতি-পাঞ্জাবি। ধুতি-পাঞ্জাবি না হলে পায়জামা-পাঞ্জাবি। ঠিক কী পাব বলতে পারছি না এখনও, তবে পাব যে এটা ঠিকই জানি।

কেন পাব বলো তো ? এটাও বেশ ধাঁধার মতো প্রশ্ন, তাই না ? তবে কিনা, তেমন ধাঁধা নাও হতে পারে এ-প্রশ্ন দিয়ে। কেননা, এ তো আমার জন্মদিনের উপহার নয় যে তোমরা কেউ জানবে না কেন পাব। এ এমন এক অনুষ্ঠান যে অনেকেই পাবে। শুধু পিঁড়ির উপরে বসে মজা করে ফোঁটা

নেওয়া, আর ফোঁটার শেষে মিষ্টি খেয়ে, উপহারের প্যাকেট হাতে নিয়ে, দিদিকে একটা জব্বর প্রণাম করা।

এই যাঃ ! বলেই ফেললাম। ভাইফোঁটা। হ্যাঁ, ভাইফোঁটার কথাই বলছিলাম। ভেবেছিলাম বেশ ধাঁধা মিশিয়ে বলব, তা আর হল না।

হল না-ই বা বলি কেন, ছোট্‌কা এবার যে-ধাঁধা দিয়েছে, সেটা অবশ্যই 'ভাইফোঁটা স্পেশ্যাল' বলা যায়। সেটা দিয়েই বরং শুরু করি। ভাইবোনের ধাঁধা এটা।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটি পরিবারের বড় ছেলেটি বলল, "আমরা যে-ক'জন ভাই, বোনের সংখ্যাও তাই।"

সেই পরিবারের বড় মেয়েটি বলল, "আমার যত বোন, ভাই তার দ্বিগুণ।"

বলো তো, সেই পরিবারে কত ভাই, কত বোন ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কার সঙ্গে হাবা মিশলে গানের তাল হয় ? যদি জানো, লিখে ফেলো।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও, মানে বলো—

সয়নমুভূসখা

গতবারের ধাঁধার উত্তর ॥ (১) দড়ি টানাটানি বা 'টাগ অব ওয়ার'। (২) 'তি' অক্ষরটা। (৩) বিজয়াদশমী।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১	২		■	৩	৪	
■		■	■	■		■
৫		৬	■	৭		৮
৯			■	১০		
■	■	১১			■	■
১২	১৩		■	১৪	১৫	১৬
১৭		■	■	■	১৮	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) উট। (৩) পঞ্চনদের একটি। (৫) শস্যবিশেষ। (৭) দরজা-জানলায় লাগে। (৯) জল। (১০) তামা ও দস্তার মিশ্রণে যা তৈরি হয়। (১১) কথায় বলে, সাত রাজার ধন এক —। (১২) এক গুপ্তসম্রাটকে যা বলা হয়। (১৪) লতা। (১৭) খই। (১৮) কবিতায় কেউ দেন, কেউ দেন না।

উপর-নীচ : (২) একই শব্দের মধ্যে মেঘ, নদী, ধ্বনি এবং এক কূটযোদ্ধা। (৪) পাখিবিশেষ। (৫) গালা। (৬) নানারকম। (৭) আক্ষরিক অর্থ করলে বানরযন্ত্র বলা যায় কি ? (৮) মাছের শত্রু। (১২) সরু কাঠি বা শিক। (১৩) কর্ম। (১৫) কোন্ মাছ স্তন্যপায়ী। (১৬) অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সবই বোঝায়।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

পু	স্ত	ক	■	বা	হ	বা
ন	■	ব	■	দ	■	লি
র্ব	■	চ	ণ	ক	■	য়া
সু	ত	■	ত্ব	■	ঘু	ড়ি
■	পো	■	বি	■	ল	■
দা	ব	■	ধা	■	ঘু	ণ
■	ন	যা	ন	জু	লি	■

রঞ্জন

মজার খেলা

এবারের খেলার জন্য চাই মোট ন'টা ব্যবহৃত দেশলাইকাঠি অথবা টুথপিক।

কাঠি ন'টাকে সাজাতে হবে একটা কুঠারের চেহারায়, নীচের ছবির মতো—

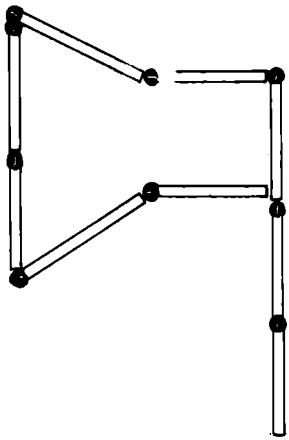

সাজিয়েছ ?

বেশ, এবার সমস্যাটা বলি।

এর মধ্যে থেকে পাঁচটা কাঠিকে তুলে নিয়ে ফের এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে কিনা পাঁচটা ত্রিভুজ তৈরি হয়।

কুঠারের বদলে পাঁচটা ত্রিভুজ তৈরির এই খেলাটা বন্ধুদের সামনে তুলে ধরলেই দেখবে, তারা কেমন উত্তর করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে।

অথচ উত্তর করাটা মোটেও শক্ত ব্যাপার নয়। তোমার নিজের হয়েছে তো ? আমার কিন্তু হয়ে গেছে। আর, আমার সমাধানটা এইরকম—

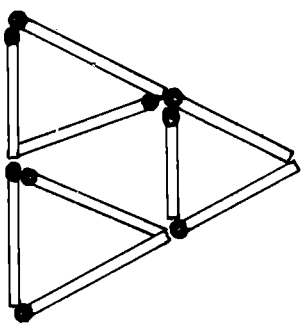

চারটে ছোট মাপের ও একটা বড় মাপের, মোট পাঁচটা ত্রিভুজ কীভাবে তৈরি হল, দেখে নাও।

মজারু

হাসিখুশি

"কাল থেকে আমি আর ইস্কুলে যাব না বাবা।"

"কেন পিকলু ?"

"আমি লিখতে পারি না, পড়তেও জানি না। মাস্টারমশাইরা আবার ক্লাসে কথা বলতেও বারণ করেছেন। তা হলে আমার ইস্কুলে যাওয়ার দরকারটা কী ?"

"আমাদের ক্লাবের রজত-জয়ন্তী উৎসবে দর্শক-শ্রোতা গোনার ভার পড়েছে আমার ওপর। হিসেব করার একটা

সহজ উপায় বাতলে দিতে পারেন ?"

"হাত আর পায়ের সংখ্যা যোগ করে চার দিয়ে ভাগ দিলেই তো হয়ে যায়।"

"আমার ছেলে দশ বছর প্যারিসে থেকে ছবি আঁকা শিখেছে।"

"তাই বলুন। দেওয়ালে ঝোলানো সূর্যাস্তের ছবিটা দেখেই বুঝেছি। ওরকম সূর্যাস্ত তো আমাদের দেশে হয়ই না কখনও।"

"ব্যাকরণের পরীক্ষায় বিষমীভবন আসতে পারে। তুমি বিষয়টা একটু বুঝিয়ে দেবে কাকু ?"

"এখন বিরক্ত কোরো না। আজ শরীরটা খুব খারাপ।"

"বাঁচতে যদি চান, কয়েক সপ্তাহ মাথার কাজ বন্ধ রাখুন।"

"কিন্তু ওটাই যে আমার বেঁচে থাকার একমাত্র রাস্তা ডাক্তারবাবু।"

"বড়সড় গবেষণা করছেন বুঝি ?"

"না, না। চৌরাস্তার ওপর সেলুনটা তো আমি একাই চালাই।"

ছবি : সেবাশিস দেব

গাবলু
আট আনায় আপেল
আট আনায় আপেল
ঝিল্কের ফিতে বেঁধে দিলুম, এবার বিক্রি হবে!
আট আনায় আপেল
আট আনায় আপেল
আট আনায় আপেল

গাবলু
দাঁড়া গাবলু, বিয়েবাড়ি থেকে তোর জন্যে একটা জিনিস এনেছি।
এই নে, মস্ত কেক।
এই কেক বালিশের নীচে রেখে ঘুমোলে স্বপ্ন সত্যি হয়।

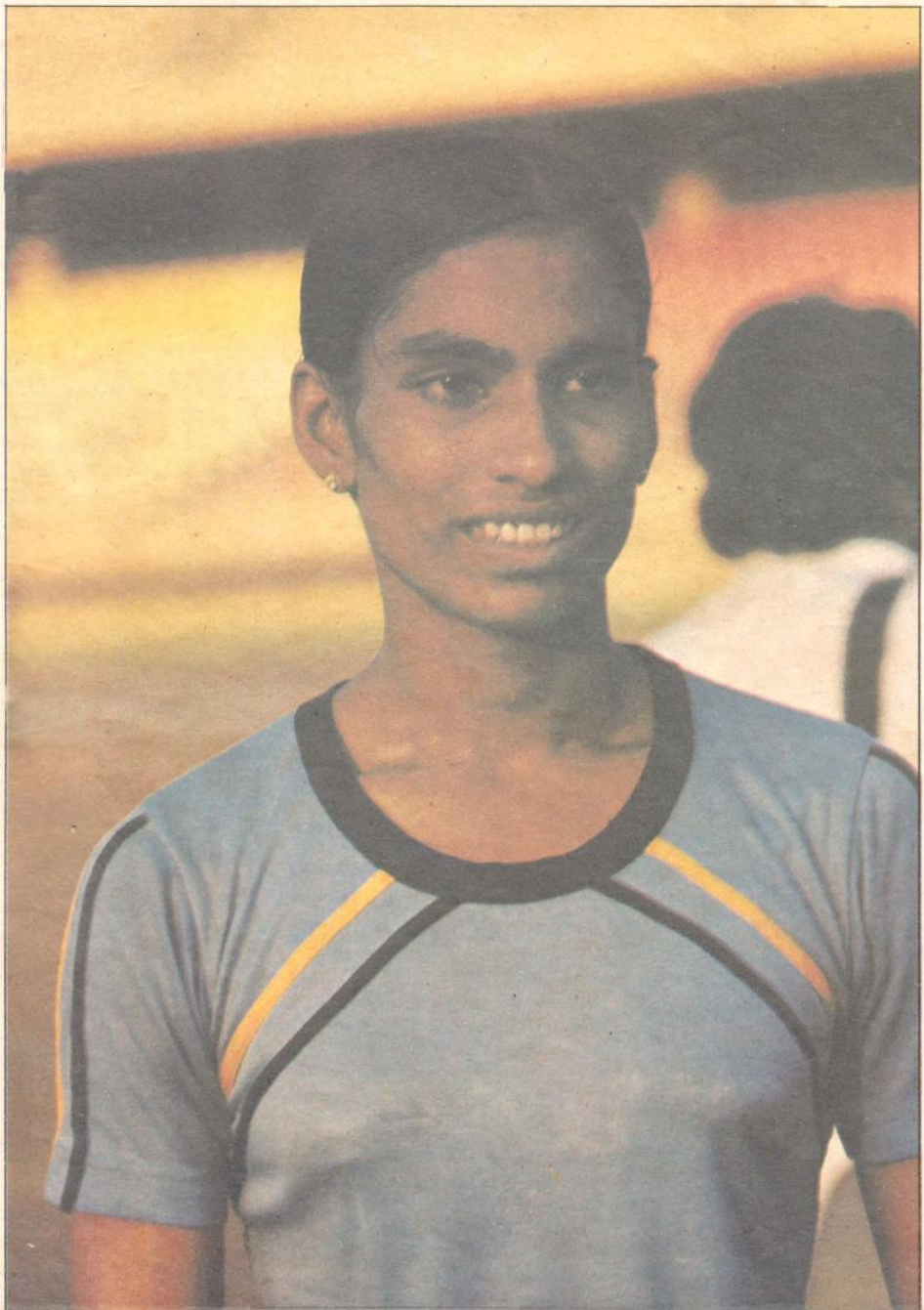

পি. টি. উষা (দশটি সোনার পাঁচটিই তাঁর) ফোটো : পি. এস. ঘিরোটা (পাতা ওলটালেই এশিয়ান প্রতিযোগিতার খবর)

সোনার মেয়ে উষা

সুব্রত সিংহ

অভূতপূর্ব সাফল্য নিয়ে জাকর্তার ৬ষ্ঠ এশিয়ান ট্র্যাক ও ফিল্ড মিট্ থেকে দেশে ফিরে এসেছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। পাঁচ দিনের (২৫—২৯ সেপ্টেম্বর) এই প্রতিযোগিতায় মোট ২৬টি দেশ অংশ নিয়েছিল। ক্যানবেরায় বিশ্বকাপ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় এশিয়ান দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলির প্রতিযোগীরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিলেন। তার ফলে প্রতিযোগিতার মানও ছিল যথেষ্ট উন্নত। তবে এই লেখা তোমাদের কাছে পৌঁছবার আগেই অবশ্য বিশ্বকাপ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার ফল তোমরা জানতে পেরে যাবে।

আগের পাঁচটি মিট্-এ ভারতের পারফরমেন্স খুব একটা ভাল ছিল না। কিন্তু এই আসরে ভারত অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে। মোট দশটি সোনা জিতে পদক তালিকায় চিনের (১৯টি সোনা) পরই স্থান করে নিয়েছে। ভারতীয় অ্যাথলিটদের এই সাফল্য বিশ্বকাপ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় এশীয় দলে সাতজনের স্থান করে দিয়েছে। এঁরা হলেন, পি· টি· উষা, বন্দনা রাও, সাইনি আব্রাহাম, বালসাম্মা, বাগিচা সিং, রঘুবীর সিং বল ও বলবিন্দর সিং।

উষা (এশিয়ান সেরা)

ভারতের এই সাফল্যে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন ভারতের 'স্প্রিন্ট কুইন' পি· টি· উষা। দক্ষিণ ভারতের ছিপছিপে এই শ্যামলা মেয়েটি মোট দশটি সোনার মধ্যে পাঁচটি একাই পেয়েছেন। ব্যক্তিগত ইভেন্ট ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও ৪০০ মিটার হার্ডলস্-এ সোনা জিতে পি· টি· উষা শুধু ভারতেরই মুখোজ্জ্বল করেননি, এশীয় অ্যাথলেটিক্সে এক বিরল নজির সৃষ্টি করেছেন। এই চারটি ছাড়া তিনি সোনা পেয়েছেন ১৬০০ মিটার রিলেতেও।

তিনি শুধু যে সোনা জিতেছেন তাই-ই নয়, একে একে এশীয় রেকর্ডগুলি ভেঙে নতুন রেকর্ডও গড়েছেন। একশো মিটার দৌড়ে তিনি ভেঙেছেন ফিলিপিনসের লিডিয়া ডি ভেগারের রেকর্ড (১১·৮২ সেঃ), লিডিয়াকেই হারিয়ে। লিডিয়াকে ব্রোঞ্জ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। উষার সময় ১১·৬৪ সেকেণ্ড। দুশো মিটারে তাঁর সময় ২৩·০৫ সেকেন্ড, যেটা ইজরায়েলের ইস্টার রথের (২৩·৭২ সেঃ) চেয়ে উন্নত। চারশো মিটারে (৫২·৬২ সেঃ) ভেঙেছেন নিজেরই রেকর্ড (৫২·৯০ সেঃ)। চারশো মিটার হার্ডলসে ৫৬·৬৪ সেকেণ্ডে দৌড়ে তিনি ভেঙে দিয়েছেন জাপানের যুমিকো আওই'র এশীয় রেকর্ড (৫৯·২৬ সেঃ)। ভারতের আর এক প্রতিযোগী বালসাম্মাও এই ইভেন্টে রুপো জিতেছেন (৫৭·৮১ সেঃ) যুমিকোর রেকর্ড ভেঙে।

সাইনি (আর-এক সোনার মেয়ে)

উষা ছাড়া ভারতকে আর যাঁরা সোনা এনে দিয়েছেন, তাঁরা হলেন সাইনি আব্রাহাম ৮০০ মিটার দৌড়ে নতুন এশীয় রেকর্ড গড়ে। শট্‌পুটে বলবিন্দর সিং, হ্যামার থ্রো'তে রঘুবীর সিং বল, ১৫০০ মিটারে বাগিচা সিং ও মেয়েদের ম্যারাথনে আশা আগরওয়াল। এ ছাড়া আর যাঁরা সফল হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল চাঁদরাম (রুপো, ২০ কিঃ মিঃ হাঁটা), বন্দনা রাও (রুপো, ২০০ মিঃ), সুরেশ যাদব (রুপো, ১৫০০ মিঃ)।

এই আসরে মেয়েদের ইভেন্টে উষার একচেটিয়া প্রাধান্যের পাশে অন্যান্য প্রতিযোগীদের কৃতিত্ব ম্লান মনে হলেও যাঁরা সোনা-জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁরা হলেন চিনের হুয়াং ডং হুয়ো (লং জাম্প), লি জিয়াধু (ডিসকাস), জিন বিও জি (১০ কিঃ মিঃ হাঁটা), উত্তর কোরিয়ার কিম লিয়ন সন (৩০০০ মিঃ)।

পুরুষদের ইভেন্টে উল্লেখযোগ্য সোনা-জয়ীদের মধ্যে আছেন ৪০০ মিটারে ফিলিপিনসের ইসিডিরো দেল প্রাদো, ২০০ মিটারে কোরিয়ার জ্যাং জেই কিউইন। এ ছাড়া ২০০ কিঃ মিঃ হাঁটায় সোনা জিতেছেন চিনের লিউ জিন লি। এই ইভেন্টে বিরাশির এশিয়াডে সোনা-জয়ী ভারতের চাঁদরাম পেয়েছেন রুপো। লং জাম্পে চিনের লিউ যু হুয়াং সোনা জিতেছেন। ৮০০ মিটারে সোনা জিতেছেন মালয়েশিয়ার বি· রাজকুমার। ৪০০ মিটার হার্ডলসে বাহরিনের আমেদ হামাদা প্রথম হয়েছেন।

জাকর্তার এই পাঁচ দিনের মিট-এ সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাথলিট ছিলেন ভারতের পি· টি· উষা। তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যই তাঁকে এত জনপ্রিয় করেছে। এমনকী স্থানীয় তারকা পুরনোমো'র জনপ্রিয়তাকেও তিনি ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। এই আসরে তিনি পেয়েছেন এশিয়ার 'ক্ষিপ্রতমা' মেয়ের সম্মান। 'ক্ষিপ্রতম' মানুষের সম্মানটি পেয়েছেন চিনের ঝেং চেন ১০·২৮ সেকেণ্ডে একশো মিটার দৌড়ে।

দেওধর ট্রফিতে পশ্চিমাঞ্চলের হ্যাট্‌ট্রিক

সম্রাট রায়

সীমায়িত ওভার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা দেওধর ট্রফিতে পূর্বাঞ্চল হাজির থাকায় আমরা একটু বাড়তি আগ্রহ নিয়ে এই খেলার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম খেলাতেই আমাদের নিরাশ করে হেরে ফিরে এল পূর্বাঞ্চল।

টস জিতে মধ্যাঞ্চল ব্যাট করতে পাঠায় পূর্বাঞ্চলকে। ওপেনার প্রণব রায় দ্বিতীয় বলেই ফিরে আসেন। অরুণলাল এবং হরি গিদওয়ানিও অল্প রানে আউট হন। ঠিক এই অবস্থায় অভীক মিত্রর ক্যাচ ফেললেন পদম শাস্ত্রী। সুযোগ কাজে লাগিয়ে অভীক শেষ পর্যন্ত ৭০ রান করলেও আর কেউই মধ্যাঞ্চলের মাঝারি মানের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারলেন না! ৫০ ওভারে পূর্বাঞ্চল ইনিংস শেষ করে ২০৩ রানে।

পালটা ব্যাট করতে নেমে রণধীর এবং প্রহরাজের বলে বেকায়দায় পড়ে যায় মধ্যাঞ্চল। মাত্র ৫৭ রানেই তারা হারায় ৪ উইকেট। অবশ্য সঞ্জয় মুদকবি (৪৪) এবং রাহুল সাপ্রু (৩১) দলকে কিছুটা এগিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত আলোর অভাবে ৩৮ ওভারের মাথায় খেলা যখন বন্ধ হয়, তখন মধ্যাঞ্চলের রান ৬ উইকেটে ১৩৯। স্কোর বুকে দেখা গেল ৩৮ ওভারে পূর্বাঞ্চলের রান ছিল ৪ উইকেটে ১৩৫।

দুর্বল পূর্বাঞ্চলের বিপক্ষে জিতলেও সেমিফাইনালে পরের ম্যাচেই মধ্যাঞ্চল হার মেনে নেয় শক্তিশালী পশ্চিমাঞ্চলের কাছে। অন্য দিকে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে হারতে হারতে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে ফাইনালে ওঠে উত্তরাঞ্চল।

অতঃপর, ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে শক্তিশালী দুই দল উত্তরাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল ট্রফি দখলের লড়াইয়ে

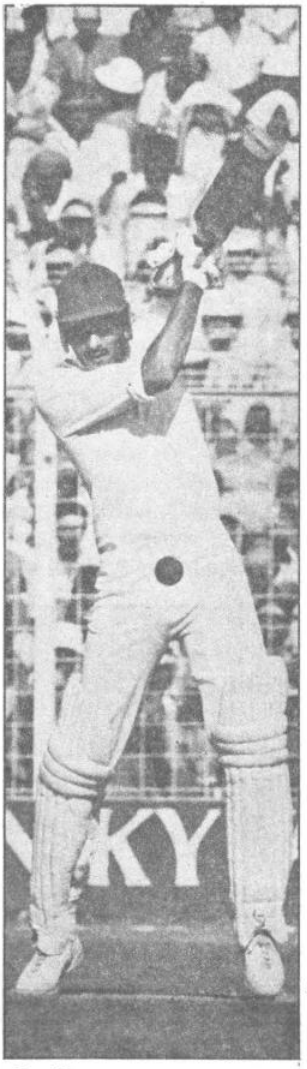

রবি শাস্ত্রী

যশপাল শর্মা

নামে। পশ্চিমাঞ্চল আগে ব্যাট করে ৪৭ ওভারে সংগ্রহ করে ৯ উইকেটে ২২৭ রান। সর্বোচ্চ রান রবি শাস্ত্রীর (৫০)। পঞ্চম উইকেটে শাস্ত্রী ও চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের জুটিতে সংগৃহীত হয় মূল্যবান ৮৭ রান। বলা যায়, ওটাই এই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। উত্তরাঞ্চলের পক্ষে বোলিংয়ে সর্বাধিক সাফল্য পান মদনলাল। তাঁর সংগ্রহ ৪২ রানে ৩ উইকেট। কপিলদেব এবং মনিন্দর সিং দু'জনেই পান দুটি করে উইকেট।

উত্তরাঞ্চলের ইনিংস শুরুতেই নড়বড়ে হয়ে পড়ে ২৮ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে। দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান মহিন্দর অমরনাথ ফিরে যান মাত্র ১ রান করে। চতুর্থ উইকেটে অশোক মালহোত্রা (৪৪) এবং যশপাল শর্মার (৭৩) অসাধারণ সংগ্রাম সত্ত্বেও উত্তরাঞ্চলের ইনিংস শেষ হয় ১৯৬ রানে। পশ্চিমাঞ্চলের পক্ষে মিডিয়াম পেসার রাজু কুলকার্নি ও অফস্পিনার অশোক প্যাটেল তিনটি করে উইকেট পান। ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন রবি শাস্ত্রী।

৩১ রানে জিতে এই নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল দেওধর ট্রফি জিতল টানা তিনবার।

ক্রিকেট ছাড়লেন অ্যালান নট

অশোক রায়

ছুটে আসছেন ক্রিস ওল্ড। ইডেনের আশি হাজার দর্শকের চোখ তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ওল্ডের ওপর। প্রথম বল, লেগ স্টাম্পের অনেক বাইরে। ব্যাটসম্যান না খেলে ছেড়ে দিলেন। বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাল টুক্‌টুকে গ্লাভসে বলটা ধরে নির্ঘাত বাই চার বাঁচিয়ে দিলেন ইংল্যাণ্ডের উইকেটকিপার। বল ধরার ওই একটা দৃষ্টান্ত দেখেই চমকে উঠল ইডেন। মুহূর্তের মধ্যে বোঝা হয়ে গেল, উইকেটের পেছনে খোঁচা মারলে ব্যাটসম্যানদের আর ঘুরে তাকাবার দরকার হবে না। হাতের গ্লাভস দুটিতে যেন আঠা মাখানো। উইকেটকিপারটির নাম অ্যালান নট।

শুধু বল ধরায় কিংবা ক্যাচ নেওয়ায় নয়, ইডেনের দর্শক নট'কে মনে রেখেছে আরও একটা কারণে। বোলার বল করতে যাচ্ছে, কিংবা হয়তো দৌড় শুরু করে দিয়েছে, তবু উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে নট ব্যায়াম করে যাচ্ছেন। নিজেকে ফিট্ রাখার এই সর্বক্ষণের চেষ্টা দেখে কেউ-কেউ হেসেছেন। কেউ-কেউ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছেন। নটের নিজের ধারণা ছিল, তাঁর শরীরের বিশেষ বিশেষ মাস্‌ল খুব আড়ষ্ট। পাছে আড়ষ্ট পেশি তাঁর অসুবিধে সৃষ্টি করে, সেই ভয়ে প্রায় সবসময় নিজেকে ব্যায়ামের মধ্যে রাখতেন নট।

ভারতীয় ক্রিকেটাররা অবশ্য নট'কে মনে রেখেছেন আরও দুটি কারণে। এক, উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে নটের স্বভাব ছিল প্রায় প্রতি বলেই চিৎকার করে অ্যাপিল করার। গাওস্কর লিখেছেন, "সময় সময় ব্যাটসম্যানের ছেড়ে দেওয়া ফুটখানেক বাইরের বলেও নট গলা চড়িয়ে অ্যাপিল করেছেন।" দুই, নট ছিলেন খুবই বিপজ্জনক ব্যাটসম্যান। সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে 'নটি' যে কতবার ভারতীয় বোলারদের নাকানি-চোবানি খাইয়েছেন তা বলে শেষ করা যাবে না। আর তাঁর ব্যাট করার ধরন ছিল এতই আলাদা যে, তাঁর বিরুদ্ধে ফিল্ডিং সাজানো শক্ত ছিল। স্পিনারদের অফ্ স্টাম্পের বাইরের বলও 'সুইপ' করে ফাইন লেগে টেনে আনতে পারতেন তিনি। পেস বোলারদের বিরুদ্ধেও এমন এক-একটা 'কাট' মারতেন যে, বোলার 'হাউজ-দ্যাট' আওয়াজ তোলার আগেই বল স্লিপের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেত বাউণ্ডারিতে।

স্বাস্থ্য ঠিক রাখার ব্যাপারে নটের সতর্কতা ছিল বাড়াবাড়ি রকমের। লাঞ্চ-টেবিলে সবাই একসঙ্গে বসলেও নট খেয়ে উঠতেন সকলের শেষে। এত আস্তে আস্তে চিবিয়ে খেতেন। প্রিয় খাবার ছিল কলা, কমলা আর দুধ। খাবার টেবিলের কোন্‌খানে নট বসেছিলেন, সেটা টের পাওয়া যেত জমানো কলার এবং কমলার খোসার পাহাড়ের দিকে তাকালেই। এমনও শোনা গেছে, অটোগ্রাফ দেবার সময় নট নাকি অন্যের কলম হাতে নিতেন না। সবসময় সই করতেন নিজের কলমে।

নট কেন্ট-এর হয়ে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রথম নামেন ১৯৬৪ সালে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৬৭ সালে প্রথম টেস্ট খেলেন। এবং প্রথম টেস্টেই সবার নজর কাড়েন ৭টি ক্যাচ ধরে। পেস ও স্পিন দুই ধরনের বোলিংয়ের বিরুদ্ধেই তাঁর কিপিং অসাধারণ উচ্চমানে পৌঁছেছিল। চমৎকার রিফ্লেক্স, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং ঠাণ্ডা মাথা একইসঙ্গে তাঁর উইকেটকিপিং এবং ব্যাটিং, দুটো ব্যাপারকেই দুর্দান্তভাবে গড়ে দিয়েছিল। ৯৫টি টেস্টে ৪৩৮৯ (৩২.৭৫) রান এবং ২৬৯টি শিকার সংগ্রহ করার পর নট এবার ছুটি নিলেন ক্রিকেট থেকে।

নটের স্পোর্টস গুডসের দোকান আছে। ব্যবসার কাজে বেশি সময় দেবার জন্যই হয়তো ক্রিকেট ছাড়লেন তিনি। গাওস্কর ঠাট্টা করে লিখেছেন, উইকেটের পেছনে তিনি ক্রিকেট মাঠে যতটা সফল, আশা করা যায় এবার তাঁর দোকানের কাউণ্টারের পেছনেও ততটাই সাফল্য পাবেন। এখন লাল টুক্‌টুকে গ্লাভ্‌স পরে কাউকে উইকেটকিপিং করতে দেখলে আমাদের মনে পড়ে যাবে একইসঙ্গে নট এবং তাঁর স্পোর্টস গুডসের দোকানের কথা।

বিদায় ক্রিকেট! —অ্যালান নট

মরসুমে মোহনবাগানের প্রথম ট্রফি

সায়ন্তন সিংহ

মোহনবাগান শেষ পর্যন্ত তাদের সভ্য-সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছে গ্যাংটকে সপ্তম গভর্নর'স গোল্ড কাপ জিতে। ফেডারেশন কাপ ও লিগের ব্যর্থতায় মোহনবাগানের খেলোয়াড় ও অনুরাগীরা যথেষ্ট মুষড়ে পড়েছিলেন। এবারে এই জয় তাঁদের হারানো মনোবল ফিরিয়ে দেবে বলে মনে হয়। পঁচাশির মরসুমে এটিই মোহনবাগানের প্রথম সাফল্য। ফাইনালে তারা কলকাতারই আর-এক প্রধান মহমেডানকে হারায় সুবীর সরকারের গোলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর তারা এই প্রতিযোগিতায় যুগ্মবিজয়ীর সম্মান পেয়েছিল জামশেদপুর স্পোর্টিং-এর সঙ্গে। আর মহমেডান এই কাপ জিতেছিল ১৯৮০ সালে।

তবে ফাইনালে মোহনবাগান জিতলেও খেলায় প্রাধান্য ছিল কিন্তু মহমেডানেরই। গোল খাওয়ার পর একের পর এক আক্রমণের ঢেউ তুলেও মহমেডান গোল শোধ করতে পারেনি মূলত তাদের মন্দ ভাগ্যের জন্য। তাদের আক্রমণের মূল উৎস চিমার একটি শট্ পোস্টে লাগায় ও একটি ভলি বারের সামান্য ওপর দিয়ে চলে যাওয়ায় গোল শোধের সব আশাই বিলীন হয়ে যায়।

এই প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ও মহমেডান ছাড়া আর কোনও নামী দল না থাকা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার আকর্ষণ কিন্তু কোনও অংশে কমে যায়নি। মাঠের বড় আকর্ষণ ছিল মহমেডানের নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার চিমা ওকেরি। মোহনবাগান ও মহমেডান খেলেছে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। কলকাতার এই ডাকসাইটে দুটি দলকে কিন্তু সেমিফাইন্যালে গোয়ার মুর্মুগাঁও পোর্ট ট্রাস্ট ও সিকিম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (রেড) বিরুদ্ধে যথেষ্ট লড়াই করেই জিততে হয়েছে।

প্রথম সেমিফাইনালে মহমেডান হারায় গোয়ার মুর্মুগাঁও পোর্ট ট্রাস্টকে। ভারতীয় ফুটবলে মুর্মুগাঁও পোর্ট ট্রাস্টের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে তেমন কোনও স্বীকৃতি নেই। কিন্তু তারা মহমেডানকে সহজে ফাইনালে পৌঁছতে দেয়নি। প্রথমে তারাই এগিয়ে গিয়েছিল ওর্লান্ডো কোডিনহোর গোলে। তবে গোলটি শোধ করে দেন মহমেডানের এ-বছরের ত্রাণকর্তা ও তাদের অনুরাগীদের নয়নের মণি চিমা ওকেরি। শেষ পর্যন্ত টাই ভেঙে খেলার মীমাংসা হয়েছিল। এর আগে মহমেডানকে কোয়ার্টার ফাইনালে জিততেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল রাষ্ট্রীয় কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারের (আর সি এফ) বিরুদ্ধে। প্রথম দিন খেলা অমীমাংসিত থাকার পর দ্বিতীয় দিন

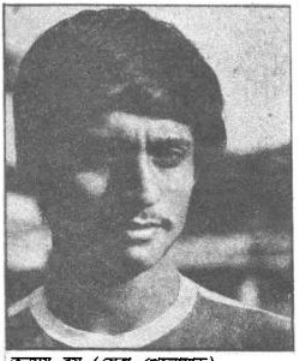

তনুময় বসু (সেরা খেলোয়াড়)

নরিন্দর থাপার করা দুটি গোলে মহমেডান জেতে।

একই ফলাফলে মোহনবাগান কোয়ার্টার ফাইনালে জিতেছিল এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে। গোলদাতা সুবীর সরকার ও ফরিদ। এরপর সেমিফাইনালে স্থানীয় দল সিকিম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (রেড) বিরুদ্ধে জিততে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছিল। সিকিমের এই দলটি একেবারেই সাধারণ স্তরের একটি দল। কিন্তু নিজেদের মাঠে তারা কলকাতার এই তারকা-সমৃদ্ধ দলটিকে যথেষ্ট সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল। মোহনবাগানকে ৮৬ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল গোলের জন্য। শেষ পর্যন্ত পায়াসের গোল মোহনবাগানকে ফাইনালে তুলে দেয়। সিকিমের দলটি বেশ কয়েকটি সুযোগের অপচয় ঘটিয়েছিল। তবে সেদিন মোহনবাগানের গোলে দুর্ভেদ্য ছিলেন তরুণ গোলরক্ষক তনুময় বসু।

আগেই বলেছি, প্রতিযোগিতার বড় আকর্ষণ ছিলেন চিমা ওকেরি। চিমা চিমা চিমা। এই নামে গ্যাংটকের ফুটবল অনুরাগীরা পাগল ছিলেন। মহমেডান দল গ্যাংটকে পৌঁছবার আগেই চিমার নামে শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টারের ছড়াছড়ি ছিল। এমনকী ফাটকাবাজরা চিমার ব্যাপারে এতই উন্মত্ত ছিল যে, মহমেডানের খেলা হলেই চিমার গোল করার উপর তারা বিরাট অঙ্কের বাজিও ধরত। এ ছাড়া চিমার জনপ্রিয়তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন কোয়ার্টার ফাইনালে আর সি এফের বিরুদ্ধে খেলায় অসদাচরণের জন্য রেফারি চিমাকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বার করে দেন। দর্শকরা তখন প্রায় খেলা ভণ্ডুলই করে দিচ্ছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল, চিমাকে খেলতে দিতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে শান্তিরক্ষা হয়। লাল কার্ড দেখার পরের খেলায় চিমা খেলতে পারেননি। কিন্তু সেমিফাইনালে তিনি খেলতে নেমে আবার হলুদ কার্ড দেখায় নিয়মানুযায়ী ফাইনালে তাঁর খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সংগঠকরা চিমার জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা করেই তাঁকে ফাইনালে খেলার অনুমতি দিয়েছিলেন।

পরিশেষে, মোহনবাগানের এই সাফল্যে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য, সেই তরুণ গোলরক্ষক তনুময় বসুর সম্পর্কে কিছু না-বললে বোধহয় সবচেয়ে বড় অপরাধ হবে। রক্ষণভাগের শেষ প্রহরী হিসেবে মোহনবাগানের দুর্গ অক্ষত রাখতে খেলায় তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা সত্যিই অতুলনীয়। তিনিই পেয়েছেন প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান। যোগ্য পুরস্কারই। প্রতাপের অনুপস্থিতি তিনি দলকে কোনও সময়েই বুঝতে দেননি।

সামনেই শারজা

চন্দ্রভানু

সীমায়িত ওভার ক্রিকেটের আর-একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসর বসতে চলেছে শারজায়। রথম্যানস্ চ্যালেঞ্জ কাপের ত্রিদেশীয় এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ভারত, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও পাকিস্তান। তবে এই প্রতিযোগিতাকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার পর্যায়ে না ফেলে বলা উচিত সৌজন্যমূলক প্রতিযোগিতা। এর আসল উদ্দেশ্য এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রিকেটারদের আর্থিক সাহায্য করা। ঠিক ক্রিকেটারদের বেনিফিট ম্যাচের মতোই। ক্রিকেটারস্ বেনিফিট ফাণ্ড সিরিজ (সি· বি· এফ· এস·) এই প্রতিযোগিতার আয়োজক।

মাত্র কয়েক মাস আগেই (মার্চ) এই রথম্যানস্ কাপের আর একটি প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে শারজাতেই। সে-কথা কেউ নিশ্চয়ই ভুলে যায়নি। অবশ্য ভুলে যাওয়ার মতো ঘটনাও নয়। রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে ভারত যেভাবে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে রথম্যানস্ কাপ ও ৪৫,০০০ ডলার আর্থিক পুরস্কার পেয়েছিল, তা কি সহজে ভোলার। এ ছাড়া ভারতের একনাথ সোলকার ও সৈয়দ কিরমানি এবং পাকিস্তানের ওয়াসিম বারি ও গুল মহম্মদকে অর্থ আর উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। আর এবার সেই সম্মান দেওয়া হচ্ছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কিংবদন্তী-ক্রিকেটার ও প্রাক্তন অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েডকে। তিনি পাচ্ছেন পঞ্চাশ হাজার ডলার, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছ' লাখ টাকা। এর পর আগামী বছর একই সম্মান পাবেন ভারতের দিলীপ বেঙ্গসরকর ও বিজয় হাজারে, এবং পাকিস্তানের জাভেদ মিয়াঁদাদ ও ওয়াজির মহম্মদ। সি· বি· এফ এস·-এর এই উদ্যোগ সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য।

আগেই উল্লেখ করেছি, প্রতিযোগিতাটি সৌজন্যমূলক। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে এই তিনটি দেশের কেউই পিছপা হবে না। একদিকে ভারতকে যেমন চেষ্টা করতে হবে তার বিশ্বজয়ীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার, তেমনই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চেষ্টা থাকবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধারের। আর পাকিস্তান সচেষ্ট হবে এই দুটি দেশকে হারিয়ে প্রমাণ করতে যে, তারাও কোনও অংশে কম যায় না। সুতরাং আশা করা যায়, তিন দেশের লড়াই হবে জোরদার।

আমাদের লক্ষ থাকবে কিন্তু ভারত এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য পায় কি না? তিরাশির বিশ্বকাপের (প্রুডেনশিয়াল কাপ) পর এ পর্যন্ত যে ক'টি সীমায়িত ওভারের প্রতিযোগিতা হয়েছে, তার সব ক'টি আসরেই ভারত তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের পারফরম্যান্স আদৌ সুখকর হয়নি। তাই এই আসরে ভারতের

বিজয় হাজারে

ক্লাইভ লয়েড

সাফল্য নিয়ে আমাদের মনে অনেক প্রশ্নই দানা বেঁধে উঠছে। বিশেষ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো প্রবল প্রতিপক্ষ যেখানে আছে।

তবে অতীতে এরকম প্রতিকূল অবস্থা থেকে ভারতকে আমরা বহুবার বেরিয়ে আসতে দেখেছি। এই তো ৮৪-৮৫'র মরশুমে দেশের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচগুলিতে ভারত যেভাবে হেরেছিল, তাতে-করে অতিবড় সমর্থকও আশা করেননি যে, অস্ট্রেলিয়ায় সাত দেশীয় বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস ওয়ার্ল্ড কাপ সিরিজ ভারত জিতবে। শুধু জেতা নয়, একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে জেতা। তাই এবারও আমরা আশায় থাকছি, শ্রীলঙ্কার ব্যর্থতা ভুলে ভারত শারজাতেও বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানের মতো খেলেই রথম্যানস্ কাপ নিয়ে দেশে ফিরবে।

এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল পাবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী দেশ পাবে যথাক্রমে তিরিশ ও কুড়ি হাজার ডলার। প্রতিযোগিতায় প্রথম ম্যাচ খেলবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও পাকিস্তান। এই খেলার বিজিত দল খেলবে ভারতের সঙ্গে। এই দুটি খেলার বিজয়ী দল ফাইনালে খেলবে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য।

শারজার এই প্রতিযোগিতায় খেলতে যাওয়ার জন্য ভারতীয় দল এখনও নির্বাচিত হয়নি। অবশ্য এই লেখা তোমাদের হাতে পড়ার আগেই ভারতীয় দল নির্বাচিত হয়ে যাবে। সম্ভবত কপিলদেবেরই উপর আবার ভার পড়বে দল পরিচালনার। তবে দলে দু'একটি পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সন্দীপ পাতিলের দলে ঢোকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে শ্রীলঙ্কায় যে অভাবটা বেশি করে অনুভূত হয়েছে, তা হল পেস বোলারের সমস্যা। তাই মদনলাল যদি দলে ঢোকেন, তা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সে-ক্ষেত্রে বাদ পড়বেন রাজিন্দর সিং ঘাই। হয়তো আমরা আবার দেখতে পাব সৈয়দ কিরমানিকে। কেননা, শ্রীলঙ্কায় বিশ্বনাথ তেমন কিছু সফল হতে পারেননি। তবে দল বা অধিনায়ক নির্বাচন না হলেও ইতিমধ্যে ভারতীয় দলের ম্যানেজার হিসেবে বেঙ্কটরাঘবন নির্বাচিত হয়ে গেছেন।

ছোট্ট বন্ধুরা। দারুন উত্তেজনার মুহূর্তগুলি এসে গেছে...

বুস্ট অন্তরীক্ষ অভিযান

বিখ্যাত সব মহাকাশ অভিযান ও অভিযানের নায়কদের রঙ বেরঙের ছবি সংগ্রহ কর। এডুইন অলড্রিন চাঁদে হাঁটছেন; ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা; মহাকাশে ভ্রমণকারী প্রথম প্রাণী লাইকা কুকুরটি এবং এরকম আরো কত ছবি!

উত্তেজনায় ভরা বুস্ট অ্যালবাম দেখতে দেখতে তোমরাও পাড়ি দিতে পার মহাকাশের মনোমুগ্ধকর জগতে।

মহাকাশ যাত্রার কাহিনী, ভবিষ্যতের অন্তরীক্ষ উপনিবেশ এবং সুদূরের নক্ষত্র ও গ্রহরাজি সম্পর্কে কতরকমের খবরই না চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

হ্যাঁ, তোমাদের খুশি হওয়ার মতো আকর্ষনীয় অনেক কিছু এতে আছে। সুতরাং মহাকাশযাত্রার হেলমেট পরে চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

অভিযান 1:

বিনামূল্যে কার্ড

প্রতি 500 গ্রামের প্যাকের সংগে একটি।

অভিযান 2:

12 পৃষ্ঠার এই অ্যালবামে আছে অন্তরীক্ষের আশ্চর্যময় জগতের চমৎকার চিত্র কাহিনী।

বিনামূল্যে

অ্যালবাম

2 টি কার্ড সংগ্রহ করলে।

HMM-8726BEN

প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য অফুরান শক্তির রসদ

ANANDAMELA 13 NOVEMBER, 1985. Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731

জনসন্স বেবী লোশন
কেননা নরম ত্বক
আপনার বয়সকে গোপন করে রাখে

জনসন্স বেবী লোশন
একটি কোমল, গোলাপী লোশন...
ত্বককে কোমল রাখার ইমোলিয়েন্ট-এর মিশ্রণ যা আপনার ত্বকের নিজস্ব আর্দ্রতা বজায় রাখার তরল পদার্থের মতই কাজ করে।

তরুণ ত্বকে এই তরল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকায় এটি আপনার স্বাভাবিক কোমলতা ও নমনীয়তা বজায় রাখে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ত্বককে কোমল রাখার প্রাকৃতিক ইমোলিয়েন্ট শুকিয়ে যেতে শুরু করে।

আপনার ত্বক তেলতেলে হলেও এমনটি হতে পারে। কেননা আপনার ত্বকের কোমলতা নির্ভর করে শুধুই তার আর্দ্রতার ওপর। তেলতেলে শুকনো হওয়ার উপর নয়।

আপনার ত্বক যে রকমই হোক না কেন, জনসন্স বেবী লোশন আপনার ত্বকের নিজস্ব স্বাভাবিক তরল পদার্থের সাথে একযোগে কাজ করে। তাতে আনে প্রাণের জোয়ার ও আপনার রূপে পুষ্টি যোগায়।

একটুখানি জনসন্স বেবী লোশনে কাজ পাওয়া যায় অনেক। এটি তেলতেলে নয় এবং এটি আপনার ত্বকে এত দ্রুত শুষে যায় যে এর কাজ শুরু হওয়া আপনি অনুভব করবেন। এটি আপনার ত্বককে কোমল রাখবে।

বয়সের চেয়ে আপনাকে ছোট দেখাবে।

জনসন্স বেবী লোশন। আপনার ত্বক কিছুতেই আপনার বয়স প্রকাশ করতে পারবে না।